বরকতময় সময়ের সঠিক ব্যবহার

আহমেদ ফারুক

টাইম ম্যানেজমেন্ট
উইথ
ইসলাম

বরকতময় সময়ের সঠিক ব্যবহার

আহমেদ ফারুক

উৎসর্গ

এইচ এম নাঈম
সেগুফা তারাঞ্জুম
শায়েখ হাসান
আমার প্রিয় তিন ...

শুভ কথা

সফলতার প্রথম কথা হলো আপনার যা কিছু আছে, আপনি যা পারেন তা দিয়েই শুরু করা। সবসময় নিজেকে বলুন আমি এ পৃথিবীর, এই সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এই সময়টা আমাকে যা দিয়েছে তা আমি ফিরিয়ে দেব আমার এবং অন্যের জীবনে। যা হবে আমার জীবনের সর্বোচ্চ চেষ্টা।

আপনি যদি ভেবে বসেন আপনি সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারবেন না, তবে আপনি প্রথমেই হেরে বসে আছেন। তাই নিজেকে একটা ছোট্ট শিশু ভাবুন। এবং ভেবে নিন আপনি নতুন একটি খেলা শিখবেন। তবেই আপনি সহজেই এই সময়ের সঠিক ব্যবহার শিখতে পারবেন।

আপনার ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগান এবং এখন এই মুহূর্ত থেকেই শুরু করুন।

আপনি অনেক আত্মউন্নয়ন বই পড়েছেন। নিজের স্কিল ডেভেলপ করার জন্য আপনি সর্বোচ্চটা দিয়েছেন। ব্রায়ান ট্রেসি থেকে শুরু করে কিয়োসাকি, ম্যাক্সওয়েল, হ্যাল এলরড মুখস্থ করেছেন। বাট কোনো কাজ হয়নি। কারণ আপনার পদ্ধতিটা সঠিক ছিল না। সমাজ আপনার অনেক কিছুই সমর্থন করেনি।

সঠিক পদ্ধতিটা তাহলে কী?

একমাত্র উত্তর ইসলাম-পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

আপনার মন খারাপ? কীভাবে তা মোকাবেলা করবেন ইসলাম বলে দিয়েছে।

আপনি ধনী হতে চান? কীভাবে হবেন? ইসলাম তা বলে দিয়েছে।

আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, পরিত্রাণের পথ পাচ্ছেন না। কী করবেন? ইসলাম তা বলে দিয়েছে।

আপনি মোধাসম্পন্ন না? কী করবেন?

আপনি বিষণ্নতায় ভুগছেন। কী করবেন?

আপনি প্রতিশ্রুতি দেবেন। কিন্তু কীভাবে?

আপনি মিথ্যা কথা বলা ছাড়তে চান কিন্তু কীভাবে?

এমন হাজার প্রশ্ন করুন। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ইসলামে।

কেন আপনি পথ খুঁজছেন অন্ধকারে? আলোতে আসুন। এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থার পক্ষ থেকে আপনাকে নিমন্ত্রণ...

আহমেদ ফারুক
একজন সুখী মানুষ

১

টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যবচ্ছেদ

'হায়! আমাদের যদি আরেকটি সুযোগ হতো, তবে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'
(সুরা আশ-শুআরা, আয়াত-১০২)

জীবন অতি ক্ষুদ্র কিছু সময়ের সমষ্টিমাত্র। কায়দাকানুন না জানলে বহু কাজ করা হবে কিন্তু ফলাফল আশানুরূপ হবে না। মহান আল্লাহতায়ালা অবশ্যই অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন সময়ের ব্যবহার সম্পর্কে। দুনিয়ার জীবনে অর্থ, যশ, খ্যাতি হারালে আবার ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু গরুর বাঁট থেকে দুধ বের হলে যেমন প্রবেশ করানো যায় না তেমনি হারানো সময় আর ফিরে পাওয়া যায় না।

মানুষের জীবনে টাইম ম্যানেজমেন্টের গুরুত্ব অনেক। এটি কাজের চাপ কমায়, অলসতা দূর করে এবং জীবনে সাফল্য এনে দেয়। আর একজন বিশ্বাসী মানুষের জীবনে টাইম ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশ্য এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং সব কাজেই তার পরম লক্ষ্য থাকে ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য অর্জন, যা তাকে এনে দেবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ মর্যাদা।

সুরা আসর, আদ-দুহা, আল লাইল, আশ শামস, আল ফজরে আল্লাহতায়ালা সময়ের কসম করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহতায়ালার কাছে সময় মহামূল্যবান।

অন্য সকল ব্যবসায়িক কাজের মতো টাইম ম্যানেজমেন্ট ইসলামিক পদ্ধতিতে শেখা যায়। তাই এটা শেখা জটিল কিছু নয়। আরো একটা ভালো ব্যাপার হলো টাইম ম্যানেজমেন্টের অনুশীলন এমন একটি অনুশীলন যা আপনাকে কিছু না কিছু সুফল অবশ্যই দেবে। অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার চেয়ে টাইম ম্যানেজমেন্টের খুঁটিনাটি নিয়ে অনুশীলন করা ভালো।

সময় ব্যবস্থাপনার সুন্দর নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। বিশ্বাসী মানুষের সময় নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিমূল হলো নামাজ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা সফল মুমিনের আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনার শুরুও করেছেন নামাজের কথা দিয়ে এবং শেষও করেছেন নামাজের আলোচনার মাধ্যমে।

'মুমিনরা সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নামাজে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে।... এবং যারা নিজেদের
নামাজের ব্যাপারে যত্নবান।'
(সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১, ২ ও ৯)

আয়াতে নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়ার অর্থ হলো ঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা। প্রকৃত মুমিন যেখানেই যে অবস্থায় থাকুক দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় ঠিক সময়ে আদায় করবেই।

প্রিয়নবী (সা.) মৃত্যুশয্যায়ও ইশারায় নামাজ আদায় করেছেন। আর পুরো দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মতো আদায় করতে হলে তাকে সদা সময়-সচেতন হতে হবে। এভাবেই মনের অজান্তে নামাজ মুমিনের টাইম ম্যানেজমেন্টের ভিত্তিমূল হয়ে ওঠে।

টাইম ম্যানেজমেন্ট অনেকটা সাইকেলে চড়ার মতো, কি-বোর্ডে লেখার মতো অথবা কোনো একটা খেলার মতো। এটা বিভিন্ন কলাকৌশল, প্রয়োগকৌশল ও পদ্ধতি দ্বারা গঠিত। এটা এমন এক কলাকৌশল যা আপনি দৃঢ় সংকল্প ও পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিখতে পারেন, চর্চা করতে পারেন এবং টাইম ম্যানেজমেন্টের একজন গুরু হয়ে উঠতে পারেন।

তবে প্রথমে আপনাকে যে কাজ করতে হবে তা হচ্ছে, আপনার সময় আসলে যায় কোথায়? তা আগে খুঁজে বের করা। বর্তমান কাজের ধারা অনুযায়ী, আপনার সময় কোথায় এবং কীভাবে ব্যয় হয় তা খুঁজে বের করা দরকার। বেশিরভাগ লোকজন এ ব্যাপারটাই এড়িয়ে যায়। যদি তারা কখনো তা খুঁজে বের করতে না চায়, তাহলে অবশ্যই টাইম ম্যানেজমেন্টের অগ্রগতি করা কঠিন।

লেখক পিটার ড্রাকারের লেখা বিখ্যাত বই 'The Effective Executive'. এই বইতে টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য তিনটি ধাপ অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। বইটির 'নিজের সময়কে জানুন' অধ্যায়ে তিনি এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন। ধাপ তিনটি হলো-

১. আপনার সময়ের বিশ্লেষণ করুন।

২. নিরর্থক চাহিদাগুলো ছাঁটাই করুন।

৩. হাতে সময় নিয়ে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করার লক্ষ্য স্থির করুন।

একজন আদর্শবান মুসলিমের প্রাত্যহিক জীবনরীতির আলোকে উপরোক্ত ধাপ তিনটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

১. সময়ের বিশ্লেষণ করুন

আপনি আপনার বর্তমান অবস্থান খুঁজে বের করুন। তাই আগামী এক সপ্তাহ আপনার সময় কীভাবে কাটছে তা লিপিবদ্ধ করুন। আপনি এর জন্য খাতা-কলম, ডায়েরি, কম্পিউটার বা মোবাইলের প্যাড ব্যবহার করতে পারেন। আপনি এক সপ্তাহ পর দেখতে পাবেন যে আপনি কতটা সময় অপচয় করেন।

এটা খুঁজে বের করার জন্য প্রথম কাজটি হচ্ছে পরিমাপ করা। অনুমান করবেন না। অনুমানে কাজ হয় না। পরিমাপ করার সহজ উপায় হচ্ছে পাই চার্টের ব্যবহার। এতে করে সহজেই শতাংশের হিসাবে সময় ও কাজের পরিধি দেখা যায়। আপনার কাজের মূল খাতগুলো লিখুন। তারপর পাই চার্টের বিভিন্ন অংশে খাতগুলো উল্লেখ করুন। এসব খাতে থাকতে পারে-

❖ লেখালেখি
❖ ফোন করা
❖ মিটিং
❖ পরিকল্পনা ইত্যাদি।

আরো ব্যক্তিগত বা ভিন্ন কিছুও থাকতে পারে। আপনি নিজের মতো করে বসিয়ে নিন।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে একটি টাইম লগ ব্যবহার করা। টাইম লগ হচ্ছে সময় ও কাজের উদ্দেশ্য লিখে রাখার একটি খাতা বা ডায়েরি। টাইম লগ ব্যবহার করে আপনি বেশ পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্টভাবে আপনার সময় আসলে কোথায় যায়-তা দেখতে পাবেন।

দিনের সবকিছু নথিভুক্ত করবেন, কমপক্ষে এক সপ্তাহ কী করেছেন তা উল্লেখ করবেন। যদি সম্ভব হয় এক মাসের সময় হিসাব নথিভুক্ত করুন। এটা করতে খুব বেশি সময় লাগে না, মাত্র দু-এক মিনিট। কিন্তু আপনাকে শৃঙ্খলার সাথে এটা পালন করতে হবে।

খুব অল্প লোকই আছে যারা নিজেদের সময়ের ভাগ-বণ্টন দেখে অবাক হয় না। অবশ্য যারা এ ডায়েরি ঠিকমতো লিখে রাখতে পারে, তারা হয়তো চিন্তা করে তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছুতেই সময় দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তারা ভিন্ন কিছুতে সময় ব্যয় করছে, যা তাদের করার কথা নয়। তাই সামনে যা আসে তাই করবেন না। আগে টাইম লগ লিখুন। ডায়েরিতে লেখা বজায় রাখুন। তারপরই আপনি বুঝতে পারবেন, কোন খাতে কত সময় যাচ্ছে এবং কত সময় দেয়া উচিত।

এটা অবশ্যই আপনার জন্য মেনে নেয়া কষ্টকর হবে। তবে নিজের সাথে সত্যবাদীর মতো আচরণ করাটাই হলো প্রতিকারের প্রথম পদক্ষেপ।

'সৎ লোক সাতবার বিপদে পড়লে আবার উঠে, কিন্তু অসৎ লোক বিপদে পড়লে একবারে অধঃপতন ঘটে।'

হযরত সোলাইমান (আ.)

২. নিরর্থক চাহিদাগুলো বাদ দিন

আপনার চলমান সময়ের মাত্র এক সপ্তাহ বিশ্লেষণের পর আপনার মধ্যে দুঃখবোধ হতে পারে। এই দুঃখবোধ ঝেড়ে ফেলুন এবং ভাবুন- আমরা এমন অনেক কিছুই করি যা একেবারেই ঝেড়ে ফেলা যায়।

আপনার এমন মনে হতেই পারে যে সকালবেলা চা খাওয়ার অজুহাতে চায়ের দোকানে অযথা এক ঘণ্টা আড্ডা দিয়েছি। যার কোনো ভালো দিক নেই। বরং ওই চায়ের দোকানে যেসব বেহুদা কথা বলেছি তার অধিকাংশই ছিল গিবত, অর্থাৎ অন্যের সমালোচনা। অথচ গিবত সম্পর্কে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আমরা জানি 'গিবত' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরনিন্দা করা, কুৎসা রটানো, পেছনে সমালোচনা করা, পরচর্চা করা, দোষারোপ করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ অন্যের সামনে তুলে ধরা। ইসলামি শরিয়তে গিবত হারাম ও কবিরা গুনাহ। হাদিসের বর্ণনা এসেছে-

'যারা অগ্র-পশ্চাতে অন্যের দোষ বলে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংসের দুঃসংবাদ।'

(মুসলিম)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন-

'আর তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না।'

(সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১২)

'দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।...অবশ্যই তারা হুতামাতে (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জানো হুতামা কী? তা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চয় বেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।'

(সুরা হুমাজা, আয়াত : ১-৯)

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত-

'রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা কি জানো গিবত কাকে বলে?' সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) ভালো জানেন।' তিনি বলেন, 'তোমার কোনো ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে, তা-ই গিবত।'

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি যে দোষের কথা বলি, সেটা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলেও কি গিবত হবে?'

উত্তরে রাসুল (সা.) বলেন, 'তুমি যে দোষের কথা বলো, তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তবে তুমি অবশ্যই গিবত করলে আর তুমি যা বলছ, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার ওপর তুহমত ও বুহতান তথা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছ।'

(মুসলিম)

যদি কেউ কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, ইসলামি দণ্ডবিধিতে তাকে ৮০ দোররা (চাবুক) দেয়া হবে। এরা ফাসিক, পাপী, অপরাধী। শরিয়তের আদালতে এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

গিবত সম্পর্কে আরো অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে। তবে ওপরের সামান্য আলোচনা থেকেই বোঝা যায় আমরা শুধু চায়ের দোকানে নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই অযথা সময় নষ্ট করছি। ব্যাপারগুলো অন্যভাবেও ভাবা যেত।

- ❖ চায়ের দোকানে বসে এক ঘণ্টা সময় বৃথা নষ্ট না করে বাড়িতেই চা বানিয়ে কি খাওয়া যেত না?
- ❖ বাড়িতে চা বা কফি বানিয়ে তা পান করতে করতে কি ইমেইল বা টুকিটাকি অন্য কাজগুলো করা যেত না?
- ❖ টিভির চ্যানেল হাতড়ে বা ফেসবুক বা অন্যান্য অ্যাপস ঘেঁটে প্রতিদিন সাত-আট ঘণ্টা সময় ব্যয় করা কি আমাদের জন্য সত্যিই জরুরি?

আমরা কি এসব থেকে সময় বাঁচাতে পারি না?

(সাধবান! আল্লাহর জন্য বরাদ্দ সময় বাঁচাতে যাবেন না! 'সময় বাঁচানো'র নামে কিছু লোক মসজিদে সালাত আদায় করতে যায় না। এই রকম সময় বাঁচানো নিষ্ফল কর্ম। মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। অতএব, সময় বাঁচানোর নামে দ্বীনের কাজের সময় কমাতে যাবেন না। দ্বীনের জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় না করার দায়ে আমরা ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত। তাই পরিস্থিতি আরো খারাপ করতে আমরা যেন সময় বাঁচানোর অজুহাতকে ক্ষেত্রে ব্যবহার না করি।)

৩. হাতে সময় নিয়ে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করার লক্ষ্য স্থির করুন

যখন আপনি কঠিন কিছু নিয়ে কাজ করছেন। পুরোপুরি কাজের মধ্যে নিমগ্ন। এমন সময় একটা ফোন কল বা ইমেইল কিংবা মেসেজ অ্যালার্ট কি বিরক্তিকর নয়?

আপনাকে অবশ্যই সময় ভাগ করে নিতে হবে। এই ভাগ হতে হবে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সময় ভাগে বিভক্ত। অনেকের মতে, একনাগাড়ে সর্বোচ্চ ৯০ মিনিট মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব। তবে এই ৯০ মিনিট হতে হবে বিরতিহীন। সামান্য পরিমাণ কাজ করে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফলাফল লাভ করতে এই পদ্ধতি সহায়তা করবে।

এই সর্বোচ্চ ফলাফল লাভের কারণটা খুব সহজ। আর তা হলো, আপনি এভাবে কাজ করলে একটি কাজের প্রতি আপনার সবটুকু মনোযোগ কাজে লাগে নিবিড়ভাবে এবং নির্বিঘ্নে। এক ঘণ্টার একটি কাজ করতে আপনার চার ঘণ্টা লেগে যাবে যদি প্রতি ১০-১৫ মিনিটে আপনি বিরতি নেন বা বাধাপ্রাপ্ত হন।

সময়ের সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাই প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। নইলে পরে পস্তাতে হবে।

'জীবনভর গালিব এই ভুলটাই করে গেলো। ধুলো ছিল চেহারায়। অথচ আয়না পরিষ্কার করে গেলো।'

মীর্জা গালিব

বিশ্বাস করুন এবং মন থেকে বিশ্বাস করুন। অবশ্যই আপনি আপনার সময়কে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন। এটা আপনার সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। এই সামর্থ্যের কারণেই আপনার পেশাগত জীবন বা সাংসারিক জীবনে সাফল্য বা ব্যর্থতা ঘটে।

সময় ব্যবস্থাপনা করতে পারার যে সামর্থ্য তা থেকেই মূলত একজনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ধারিত হয়। যেকোনো কিছুতে কৃতিত্ব অর্জন করতে বা নিপুণতা তৈরি করতে সময় একটি অপরিহার্য ও অপূরণীয় উপাদান। এটা আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তবে সময়কে আপনি সঞ্চয় করে রাখতে পারবেন না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে-

Time and tide wait for none

(সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না)

সময় যদি একবার হারিয়ে যায় তবে আপনি এটা পুনরুদ্ধারও করতে পারবেন না। বাংলা প্রবাদটাও কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে-

সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়

আপনি যাই করুন না কেন, আপনার সময়কে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে হবে। তাই আপনি আপনার সময়কে যত ভালো করে প্রয়োগ করবেন, ততবেশি কাজ সম্পাদন করতে পারবেন এবং পুরস্কারও পাবেন তত বড়।

আল্লাহ মানবজাতিকে অসংখ্য-অগণিত নেয়ামত দান করেছেন, সেই নেয়ামতের অথৈ সাগরে আমরা ডুবে আছি। এই নেয়ামতের হিসাব করে কখনো শেষ করা যাবে না, বান্দা এই নেয়ামতের কতটুকু শুকরিয়া আদায় করে এ বিষয়টি চিন্তার বিষয়।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুরা আর-রহমানে অসংখ্যবার ইরশাদ করেছেন-

'তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

অপর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন-

'যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, তবে গুনে
শেষ করতে পারবে না।

(সুরা ইব্রাহিম, আয়াত-৩৪)

আল্লাহপাক আমাদের যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার মাঝে সময় হচ্ছে অন্যতম একটি নেয়ামত, এই নেয়ামতের গুরুত্ব অনেক বেশি।

পৃথিবীর শুরুর লগ্ন থেকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র, সবকিছুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিচালনা করে আসছেন। সূর্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হয়, আবার নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যায়।

একবার ভেবে দেখুন তো, যদি মহাবিশ্বের গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু ইত্যাদি নিয়মের মধ্যে না চলত, অর্থাৎ যদি সময়ের হেরফের হতো তাহলে কী অবস্থা হতো?

আল্লাহ পবিত্র কোরআনের একাধিক জায়গায় দিবারাত্রির কসম খেয়েছেন। কোথাও দিনের কসম, কোথাও রাতের কসম, কোথাও সকালের, আবার কোথাও সময়ের কসম খেয়েছেন। যার দ্বারা সময়ের গুরুত্ব খুব সহজেই বোঝা যায়। এছাড়া শরিয়তের হুকুম আহকামের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, ইসলামের প্রতিটি ইবাদতের জন্য আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই সময়ের সাথে সময়ের কাজ শেষ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে দিনশেষে কেবলই শূন্য।

বেলা শেষে উদাস পথিক ভাবে,
সে যেন কোন অনেক দূরে যাবে-
উদাস পথিক ভাবে।

(পথহারা, কাজী নজরুল ইসলাম)

মহান আল্লাহ হজ যেমন নির্দিষ্ট সময় পালন করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, জাকাত নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল হলে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, ফরজ নামাজের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন।

এভাবে শরিয়তের আরো অন্যান্য হুকুম-আহকামের মাঝে সময়ের মালা গাঁথা রয়েছে। নামাজের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

'নিশ্চয়ই নামাজ মুসলমানদের ওপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।'

(সুরা নিসা, আয়াত-১০৩)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি উত্তরে বললেন, যথাসময়ে আদায়কৃত নামাজ।'

(বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, নাসায়ি)

ওই আয়াত ও হাদিস দ্বারা বোঝা গেল সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই সময়ের কদর করতে হবে। সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। হেলায় খেলায় সময়কে নষ্ট করা যাবে না। সময় এমন এক মূল্যবান সম্পদ ও এমন একটি রত্ন, যা একবার চলে গেলে আর কখনই ফিরে আসবে না। ধনসম্পদ তো হারিয়ে গেলে তা আবার ফিরে পাওয়ার আশা থাকে, কিন্তু সময় যদি হারিয়ে যায় তা আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না।

সুতরাং বোঝা গেল ধন-সম্পদ থেকেও সময় অতি মূল্যবান। এভাবেই সময় তার নিজ গতিতে চলতে থাকে, সবকিছু শুরু হয়, আবার শেষ হয়, রাত যায় দিন আসে, দিন যায় রাত আসে, শেষ হয়ে যায় সপ্তাহ, পক্ষ, মাস ও বছর। এভাবেই চলতে থাকে আমাদের জীবন প্রহর। সময়ই মানুষের জীবন, আরবিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে-

সময়ের নামই তো জীবন, তাকে নষ্ট করো না।

সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা যেমন ব্যক্তি সফলতার উচ্চ আসনে পৌঁছে। অন্যদিকে এর অবহেলার দ্বারা সে নিক্ষিপ্ত হয় ব্যর্থতার অতল গহ্বরে। সময়কে যারা মূল্যায়ন করে, তারাই সফলকাম হয়, তাদের ভবিষ্যৎ হয় উজ্জ্বল।

আল্লাহ আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন নির্দিষ্ট হায়াত দিয়ে। মানে আপনার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আপনি আপনার বরাদ্দকৃত সময়ের এ সেকেন্ড বেশি সময়ও পাবেন না। তাই আপনার নিজের জন্য, সৃষ্টিকর্তার জন্য, সমাজের জন্য, সর্বোপরি সৃষ্টিজগতের জন্য আপনার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তা আপনার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

'জীবনকে তোমার বিরুদ্ধে না রেখে বরং তোমার সঙ্গী করে নাও।'

(শামস তাবরিজি, ইরানি সুফি)

সময়কে মূল্যায়ন করে যারা সম্মানিত হয়েছেন? কীভাবে?

১. **ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) :** তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত, তখনো তিনি ফিকহি একটি মাসআলা নিয়ে চিন্তারত ছিলেন।

২. **হজরত দাউদ তায়ী (রহ.) :** তিনি রুটির পরিবর্তে ছাতু খেতেন, কারণ জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, রুটির পরিবর্তে ছাতু খেলে ৫০ আয়াত বেশি তেলাওয়াত করা যায়।

৩. **বিখ্যাত নাহুবিদ খলিল ইবনে আহমাদ (রহ.) :** তিনি বলতেন, আমার কাছে সবচেয়ে অসহ্যকর লাগে ওই সময়টুকু যখন আমি খাওয়া-দাওয়া করি। *(সাফহাতুম মিন সাবরিল উলামা)*

এভাবে আরো অনেক অসংখ্য অগণিত জগৎসেরা মানুষ রয়েছেন যাদের কাছে সময়ের মূল্য ছিল অপরিসীম। যার কারণে তারা হতে পেরেছেন যুগশ্রেষ্ঠ উপাধি। পেয়েছেন ইহজগতে মানুষের ভালোবাসা আর ইহলোক ও পরলোকে আল্লাহর রহমত।

হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচটি জিনিসের আগে অপর পাঁচটি জিনিসকে গুরুত্ব দাও।

(১) বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে যৌবনকেং
(২) অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থকে
(৩) দরিদ্র হওয়ার আগে স্বাবলম্বিতাকে
(৪) ব্যস্ততার আগে অবসরতাকে
(৫) মৃত্যুর আগে জীবনকে

(তিরমিজি, মিশকাত হা/৫১৭৪, ইবনে আবি শাইবা ৩৫৪৬০)

সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এটার ওপর নির্ভর করে আপনার সফলতা কিংবা ব্যর্থতা। যদিও সফলতা আর ব্যর্থতার সংজ্ঞা পেশাগত জীবনে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। এমনকি সফলতার মূল মন্ত্রটা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ। সময়ের যথাযথ ব্যবহারের ফলে মানুষ সফলতা লাভ করে এটা যেমন সত্যি, তেমনি এই সফলতা লাভের আগে আপনাকেই নির্ধারণ করতে হবে আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান বা সহজভাবে বলে কোথায় গিয়ে পৌঁছলে আপনি নিজেকে সহজ ভাববেন।

টাইম ম্যানেজমেন্ট এমনি এক পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন। তবে পুরো ব্যাপারটাই আপনার সাধ্যের ওপর নির্ভর করে। আপনাকে লক্ষ্য আগেই ঠিক করতে হবে। কারণ এমন লক্ষ্য আপনি ঠিক করলেন যা অর্জন করা মূলত আপনার সামর্থ্যের বাইরে।

ধরুন আপনি ভালো ক্রিকেটার হতে চান। সে হিসেবে আপনি সময়ের সঠিক ব্যবহার শুরু করলেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যদি আপনার মধ্যে ক্রিকেট খেলার ঐশ্বরিক ক্ষমতা না থাকে তবে আপনি তা পুরোপুরি অর্জন করতে পারবেন না। কিংবা দ্রুত ব্যর্থ হবেন।

সময় ব্যবস্থাপনায় আপনি যদি দক্ষ হতে চান তবে নিজেকে প্রশ্ন করুন- আপনার বর্তমান সময়গুলো কোথায় যায়? অর্থাৎ আপনি বর্তমান সময়গুলো কীভাবে খরচ করছেন? এ প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করেই শুরু করুন আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ। এ কাজটা একেবারেই সহজ আবার অত্যন্ত কঠিন। কারণ একেবারে চোখের সামনে যা থাকে তা সচরাচর আমরা দেখতে পাই না। তাই নিজেকে প্রস্তুত করতে কিছু পদ্ধতির অবলম্বন প্রয়োজন। খুব সহজ পদ্ধতিতে বিষয়গুলাকে আপনি খুঁজে বের করতে পারেন।

'ইহকাল-পরকালে যাহা আবশ্যক তাহা যৌবনে সংগ্রহ করিও।'

(শেখ সাদি, ফার্সি কবি)

২
সফলতার সূত্র বিশ্লেষণ

'জীবনে তোমার যা-ই হোক না কেন, কখনো হতাশ হয়ে পড়ো না। এমনকি সবগুলো দরজাও যদি বন্ধ হয়ে যায়, একটি গোপন পথ তুমি খুঁজে পাবেই পাবে যার খোঁজ দিস কেউ জানে না।'

শামস তাবরিজি, ইরানি সুফি

মৃত্যুর পরে কেউ তার সম্পদ বহন করে না। বিষয়টা আমরা সবাই জানি। আরো জানি যে সিগারেট, তামাক, অ্যালকোহল প্রাণঘাতী, কিন্তু এখনেও জীবনের হিসাব মেলাতে পারি না।

এমন হাজার হাজার জিনিস রয়েছে যা আমরা জানি তবে আমরা কখনই সেগুলোর যত্ন করি না, সেগুলো অনুশীলন করি না এবং শেষ পর্যন্ত এগুলোর জন্য চরম মূল্য পরিশোধ করি।

জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী? কোনো বিষয় জানা বা বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ করা? নাকি অজ্ঞ থাকা?

ধরুন সিগারেট বর্জন করার বিষয় এলো। যে ব্যক্তি সিগারেট সম্পর্কে অবহিত নন তাকে অজ্ঞ বলা যায়, তবে যে ব্যক্তি সমস্ত কিছু জানে, তারপরও অবহেলা করে তিনি অবশ্যই বোকা। আপনার বিভাগ নির্বাচন করুন, আপনি আসলে কী?

অজ্ঞ, বোকা বা নাকি জ্ঞানী?

তাহলে এবার নিচের বিষয়গুলো একটু ভাবুন-

- ❖ একজন মানুষের জীবনে ব্যর্থতার জন্য আসলে কে দায়ী? অন্যরা নাকি সে নিজে?
- ❖ যদি কেউ আত্মতুষ্ট না হয় এবং সর্বক্ষণ বিষয়টি নিয়ে নিয়তিকে দোষারোপ করে আর এ কারণে সে তার মূল্যবান জীবন নষ্ট করে, তাহলে কাকে দোষী করা হবে, অন্যদের নাকি তাকে?
- ❖ যদি কেউ প্রদত্ত সুযোগ কাজে না লাগায়, তবে দোষী কে, অন্যরা না সে নিজে?
- ❖ যদি কেউ একটি অসাধারণ জীবন কাটাতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও একটি সাধারণ জীবনযাপন করে, তবে দোষী কে? অন্যরা নাকি সে নিজে?
- ❖ যে কেউ আধো মন দিয়ে কাজ করে এবং তারপর শেষ পর্যন্ত হতাশার ডুবে যায়, দায়ী কে, অন্যরা নাকি সে নিজে?
- ❖ যদি কেউ হতাশাবাদী ও জীবনের প্রতি মারাত্মকভাবে সংবেদনহীন হন তবে দোষী কে, সে নিজেই না অন্য কেউ?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকটি ত্রুটি ও ব্যর্থতার মুখোমুখি হওয়ার পর, অনেকেই হীনমন্যতার জটিলতায় পড়ে। সময়ের ব্যবধানে কাপুরুষ হয়ে যায়। মানসিকভাবে কাপুরুষ ব্যক্তি তখন এটা দেখতে সক্ষম হয় না যে আসলে সাফল্য ও ব্যর্থতা একই মুদ্রার দুটি দিক। আর তা আমাদের জীবনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমনকি সে কেন পরাজিত হয়েছে তার কারণগুলোও খুঁজে পায় না। ধরেই নেয় সে হেরে গেছে। পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তিনি পরাজিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অন্যরাও তার চেয়ে অনেক ভালো। এমন পরিস্থিতি থেকে বের

হয়ে আসতে টাইম ম্যানেজমেন্টের সঠিক ব্যবহারবিধি জানা অত্যন্ত জরুরি। আর ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে সফলতার জন্য তাই পুরো বিষয়টাকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. লক্ষ্য (যা বাস্তবসম্মত)
২. বিশ্লেষণ (নিজেকে যাচাই)
৩. সময়ের যথাযথ প্রয়োগ (সময় ব্যবহারে অনুশীলন)
৪. ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দৃঢ়তা (চূড়ান্ত সফলতা কিংবা ব্যর্থতা)

আসুন ইসলামের আলোকে সময় ব্যবহারের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে জেনে নিই। এসব কৌশল আয়ত্তে নিতে পারলে আপনার কর্মদক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম ভাগ হচ্ছে- লক্ষ্য। যদিও ব্রায়ান ট্রেসি তার 'টাইম ম্যানেজমেন্ট বইতে এই প্রথম ভাগের নাম দিয়েছেন 'আকাঙ্ক্ষা'। কিন্তু মানুষ স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সব আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ বাস্তবসম্মত নয়। তাই আকাঙ্ক্ষাকে পরিস্রুত করে তার নির্দিষ্ট বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ জরুরি। আর এটা নির্ধারণ করতে হলে আপনার মধ্যে একটি তীব্র ইচ্ছে থাকতে হবে যা আপনার সময়কে নিয়ন্ত্রণ করবে। আপনাকে দৃঢ় সংকল্পে থাকতে হবে যে আমার সময়কে আমি সর্বোচ্চ কাজে লাগাব।

দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে- বিশ্লেষণ। আপনাকে অবশ্যই একটি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের ওপর থাকতে হবে যে আমি একজন সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ার জন্য টাইম ম্যানেজমেন্টের কলা-কৌশলগুলোকে ততক্ষণ কাজে লাগাব যতক্ষণ পর্যন্ত না এগুলো আমার একটি অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে। আর বিশ্লেষণ তখনই সম্ভব তখন কাজের মাঝে ধারাবাহিকতা আনতে সক্ষম হবে।

আসলে 'টাইম ম্যানেজমেন্ট বিশ্লেষণ' হচ্ছে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে ব্যবস্থাপনা করা। কারণ, টাইম ম্যানেজমেন্টের থিওরি হচ্ছে-সময়কে ব্যবস্থাপনা করা যায় না। এটি তার নির্ধারিত নিয়মে বয়ে চলছে; এর গতির ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। তাই বলা যেতে পারে, You cannot manage your time; rather you have to be managed according to your time. অর্থাৎ আপনি সময়কে ব্যবস্থাপনা করতে পারেন না; তাই সময় অনুসারে আপনার নিজেকেই ব্যবস্থাপিত হয়ে যেতে হবে।

তৃতীয় ভাগ হচ্ছে- সময়ের যথাযথ প্রয়োগ। আপনার মধ্যে অবশ্যই অধ্যবসায়ী একটি লক্ষ্য থাকতে হবে। বিশ্লেষণ শেষ হলে সময়কে কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যত বাধাই আসুক আপনাকে ধৈর্য ধরে সেগুলোর মুখোমুখি হতে হবে। নিজেকে ধরে রাখতে হবে যতক্ষণ না আপনি একজন দক্ষ সময় ব্যবহারকারী হচ্ছেন।

সুতরাং সময় ব্যবস্থাপনার কৌশলের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় লক্ষণীয়-

১. টেলিফোনে সাক্ষাতের সময় নিশ্চিত করা
২. কাগজ, কলম, নোট বুক সাথে রাখা
৩. কিছু কাজ অন্যকে দিয়ে করান
৪. গড়িমসি বন্ধ করা
৫. কীভাবে সময় নষ্ট হয় তা খুঁজে বের করা
৬. গুরুত্ব অনুসারে কাজের ক্রম নির্ধারণ
৭. রুটিন তৈরি করা ও যতটা সম্ভব মানার জন্য চেষ্টা করা

৮. কাজের জন্য সময় নির্ধারণ
৯. কাজ হওয়া উচিত পরিকল্পনার আলোকে
১০. শেখার ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে শিখে নেয়া
১১. ফাইলপত্রসহ সবকিছুর সঠিক আর্কাইভিং করা
১২. বড় কাজকে ছোট ছোট পার্টে ভাগ করে ফেলা
১৩. ছুটির দিন বা অবসরের দিনকে কাজে লাগানো
১৪. তাড়াতাড়ি করুন, কিন্তু তাড়াহুড়া করবেন না
১৫. কাজের কোয়ালিটি নিশ্চিত করা জরুরি।
সময় বাঁচানোর কৌশল-
১. প্রত্যেকটি জিনিস তার নির্দিষ্ট স্থানে রাখা
২. একটি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা
৩. সফলতার জন্য বারবার চেষ্টা করা
৪. বদভ্যাস ত্যাগ করা
৫. কী ধরনের কাজ তা পরিকল্পনা করা
৬. সময়ের ধারাবাহিক ব্যবহার
৭. সময় নষ্টের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা
৮. সকল ধরনের মানসিক চাপমুক্ত থাকা।

অবশেষে চতুর্থ ভাগ- ব্যর্ততার বিরুদ্ধে দৃঢ়তা। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যতই চেষ্টা করেন। মহান আল্লাহতায়ালার দয়া এবং রহমত ছাড়া বরকতময় জীবন গড়তে পারবেন না। মুমিনদের জন্য মহান আল্লাহ পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছেন।

'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী।'

(সুরা আ'লা, আয়াত: ১৬-১৭)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

'জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ-মসিবত দ্বারা।'

(বুখারি, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬০)

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।'

(মুসলিম ২৯৫৬, তিরমিজি ২৩২৪, ইবন মাজাহ ৪১১৩, আহমদ ৮০৯০, ২৭৪৯১, ৯৯১৬)

এখানে বুঝতে হবে যে আপনি যদি কোনো কারণে অসফল হন তবে এটা আপনার জন্য পরীক্ষা হতে পারে। তাই আপনার মধ্যে দৃঢ় সংকল্প আনতে হবে। মনে রাখবেন যদি আপনার ইচ্ছে থাকে এবং সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করেন তবে কোনো ব্যর্থতা দীর্ঘস্থায়ী নয়।

টাইম ম্যানেজমেন্ট অনুশীলনের ব্যাপার। এই চর্চা ধরে রাখতে আপনাকে অবশ্যই শৃঙ্খল হতে হবে। মানতে হবে ধর্মীয় রীতিনীতি। আর তা নির্ভর করে আপনার ইচ্ছাশক্তির ওপর। সময়ের সঠিক ব্যবহারের ফলেই সর্বোত্তম শিক্ষা অর্জন করা যায়।

'জীবন এবং সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, জীবন শেখায় সময়কে ভালোভাবে ব্যবহার করতে, সময় শেখায় জীবনের মূল্য দিতে।'

এপিজে আবুল কালাম

সময়কে দক্ষভাবে কাজে লাগাতে পারার যে ফলাফল তা বিরাট। এই বিরাট ফলাফল আপনি লাভ করতে সক্ষম। আপনার পক্ষে আপনার সময়কে দক্ষভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। আপনি পারবেন।

আপনি দেখবেন জগতে দুই ধরনের মানুষ আছে। অধিকাংশই কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু কিছু মানুষ সময়কে কাজে লাগিয়ে ভালোভাবে কর্ম সম্পাদন করে। এরাই সফল হয়, সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ লাভ করে।

তাই আজই মনে মনে সংকল্প করুন। বলুন- আমি পারব। আমাকে দিয়েই মহান আল্লাহ সম্ভব করাবেন। সবসময় মনে রাখবেন-

মোমবাতি হওয়া সহজ কাজ নয়। আলো দেয়ার জন্য প্রথম নিজেকেই পুড়তে হয়।

জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি, ফারসি কবি

৩

ইসলামের দৃষ্টিতে টাইম ম্যানেজমেন্ট

'শপথ রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত করে।'
(সুরা আল লাইল : ১-২)

একজন বাদশা, তিনি মধু পছন্দ করতেন। জনগণ তাকে কত ভালোবাসে তা পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি একটি খালি বড় পাত্র শহরের কেন্দ্রে রেখে দিয়ে বললেন, যারা তাকে ভালোবাসে তারা যেন এই পাত্রের ভেতর এক কাপ করে খাঁটি মধু রেখে দেয়। একজন ভাবল, যেহেতু অন্য সকলে মধু রাখতে যাচ্ছে তাই সে পানি রাখলে দোষ কি? এক বড় পাত্রে এক কাপ পানি কিছুই না। পরে রাজা যখন পাত্র খুললেন তখন দেখতে পেলেন শুধুই পানি। এটা পরিষ্কার, প্রত্যেকে একই ধারণা পোষণ করেছে।

এ গল্প শিক্ষা দেয় যে, দায়িত্ব হলো ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যরা করবে এই ভেবে আপনি আপনাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন না। রাসুল (সা.) এ কথাটি এভাবে বলেছেন-

'তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রাখাল। অর্থাৎ দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।'
(সহিহ আল বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আল তিরমিজি এবং সুনানে আবু দাউদ)

সময় ব্যবস্থাপনা মূলত আমাদের উদ্দেশ্যসমূহকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা ও অগ্রাধিকার দেয়া, যাতে অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আরো বেশি এবং জরুরি কাজের জন্য কম সময় ব্যয় করা লাগে।

সময় ব্যবস্থাপনার প্রচলিত ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়পূর্বক সংজ্ঞা- সময় ব্যবস্থাপনা ও তা ব্যবহারের এমন পন্থা, যাতে আমাদের জীবন উৎপাদনশীলন হয় এবং আমাদের নিজেদের ও আমাদের চার পাশের সম্ভাব্য ব্যক্তিদের এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণময় হয়।

প্রিয়নবী (সা.) স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন-

'মানুষ দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে বড়ই উদাসীন, তা হলো- সুস্থতা ও অবসর।'
(সহিহ বুখারি)

আপনি কীভাবে চিন্তা করেন এবং নিজের সম্পর্কে কেমন অনুভব করেন- এ দুটি জিনিস আপনার জীবনের গুণগত মান ধরে রাখতে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। এমনকি আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার মানসিকতার যে মূল কেন্দ্র, আপনার আত্মসম্মানবোধ, এটা বোঝা যায় 'আপনি নিজেকে কতটা পছন্দ করেন' তার ওপর।

আপনার আত্মসম্মানবোধ অনেক বড় নির্ণায়ক। এটাই বলে দেয় যে আপনি নিজের সম্ভাব্য দক্ষতাগুলোকে উন্নত করতে আপনার জীবন ও সময়কে কতটা কাজে লাগান, কীভাবে কাজে লাগান। আরেকটু সহজ করে বলতে গেলে আপনার আত্মসম্মান তখনই বেড়ে যায় যখন আপনি

কোনো কাজ দক্ষভাবে করতে পারেন। আর যখন তা ঠিকভাবে করতে পারেন না তখন আপনার আত্মসম্মান হ্রাস পায়।

পয়সার অন্য পিঠের মতো আত্মসম্মানের অপর পিঠে হলো আত্মবিশ্বাস। যা আপনার মধ্যে এমন অনুভূতি তৈরি করবে যেন আপনি দক্ষ, সামর্থ্যবান ও উৎপাদনশীল একজন ব্যক্তি। এতে করে আপনার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আপনি যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে পারবেন, আপনার কাজে দক্ষ হয়ে উঠবেন এবং আপনার লক্ষ্যগুলো অর্জন করে দেখাবেন।

আপনি যতবেশি দক্ষ, সামর্থ্যবান ও উৎপাদনশীল অনুভব করবেন আপনার আত্মসম্মান ততবেশি বৃদ্ধি পাবে। আর আপনি যতবেশি আত্মসম্মান বোধ করবেন ততবেশি কার্যক্ষম ও সামর্থ্যবান হয়ে উঠবেন। এরা একে অপরকে সহায়তা করে এবং একে অপরকে শক্তি দেয়।

সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে হলে সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। একজন মুমিন আখিরাতের অফুরন্ত সময়ের দিকে তাকিয়ে দুনিয়ার অতি অল্প সময়ের কথা বিবেচনা করতে পারে। কেয়ামতের দিন দুনিয়ার জীবনকে মানুষ এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ বলে আখ্যা দেবে। তাই অলসতা না করে ভালো কাজের ময়দানে প্রতিযোগিতা করাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন-

'তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং
তারাই তাতে অগ্রগামী।'

(সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৬১)

যেসব লোকজন তাদের সময়কে দক্ষভাবে পরিচালিত করে তারা আত্মবিশ্বাসী, ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে থাকে এবং নিজেদের জীবন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়।

৪
নিয়ন্ত্রণ সূত্র

'হে, অলস ব্যক্তি। পিপীলিকার নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করো, নিতান্ত দুর্বল এই ক্ষুদ্র জীবটি কী চমৎকারভাবে
সুশৃঙ্খলভাবে দলবদ্ধ জীবনযাপন করে। গরমকালে দলবদ্ধভাবেই শীতের খাদ্য সংগ্রহ করে রাখে।'

হযরত সোলাইমান (আ.)

আল্লাহতায়ালার অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান একটি হলো 'সময়'। মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে নিয়ামতটির যথার্থ মূল্যায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলামি শরিয়াহ এ কারণে সময় ব্যবস্থাপনাকে মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছে। ইসলাম নির্দেশিত যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে সময় ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হলে মানুষের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হতে পারে।

সময় ব্যবস্থাপনার মনোবিজ্ঞানটি একটি সহজ সরল তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ সূত্র। সূত্রমতে, আপনি ততটুকুই ভালো অনুভব করবেন যতটুকু নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। এই সূত্র আরো বলে, আপনি ততটুকুই নেতিবাচক ও খারাপ অনুভব করবেন যতটুকু নিজের জীবন ও কাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন না।

হতাশাবাদী মানুষের সঙ্গে থাকা গুরুতর অপরাধ। আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন আপনার জীবনের জয় কিংবা পরাজয় কোথা থেকে আসে? উত্তরটা সহজ। আপনার পরিবার এবং সমাজ থেকেই আসে।

একটু লক্ষ করে দেখুন, আমাদের পরিবার এবং সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকে, যারা আপনার অজান্তেই নানাবিধ বিষয়ে আপনাকে আতঙ্কিত করে। তারা অবশ্যই আপনাকে অদ্ভুতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। আপনার সামর্থ্যকে হ্রাস করে।

সময় নিয়ন্ত্রণ করতে হলে এখনি আপনার চোখ বন্ধ করুন। আপনার কাছের মানুষ, আপনার পরিবারের সদস্য, সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব ও তাদের আলোচনার বিষয়ে চিন্তা করুন। আপনি দুই শ্রেণির মানুষ খুঁজে পাবেন।

প্রথম শ্রেণি

কঠিন, ভেজাল, বিরক্তিকর, অসম্ভব, করা সম্ভব নয়, লোকে কী বলবে, ওরাই বেশি ভালো, আমার দুর্ভাগ্য, আমার বাবা-মায়ের সাপোর্ট নাই, মামা চাচার জোর নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণি

দারুণ, পুরা, ১০০% দুর্দান্ত, ভালো হয়েছে, থামবেন না, আমরাই পারি, দেরি করা ঠিক হবে না, আরো এগিয়ে যান, কাজকে গুরুত্ব দিন, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন, অসম্ভব বলে কিছু নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম শ্রেণির সাথে আপনার ওঠাবসা আপনার সময়কে অনিয়ন্ত্রিত করবে। আপনি আস্তে আস্তে উদ্বেগ, উত্তেজনা, হতাশাগ্রস্ত হবেন। আপনার আত্মবিশ্বাস কমতে থাকবে। আপনি আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করতে পারবেন দেরিতে কিংবা ভুলে যাবেন।

অন্যদিকে আপনি যখন দ্বিতীয় শ্রেণির সাথে ওঠাবসা করবেন তখন আপনি উত্তেজিত বোধ করবেন। আপনার সময় আপনি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারবেন। আপনি অনুপ্রাণিত হবেন। আপনি কিছু না কিছু করতে চাইবেন। আপনার নতুন নতুন চিন্তার প্রকাশ ঘটবে। আকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের প্রসার ঘটবে। আপনি পুরো গতিতে এগিয়ে যাবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবেন।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন-

'এক বেদুইন লোক রাসুলুল্লাহ (সা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কখন হবে? নবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কী সম্বল সংগ্রহ করেছ? সে বলল, আল্লাহ এবং তার রাসুলের ভালোবাসা। নবী (সা.) বললেন, তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই তোমার হাশর হবে।'

(মুসলিম, ৮ম খণ্ড, হা/৬৫২১, বা, ই, সে)

আপনি সিদ্ধান্ত নিন আপনি হাশরের ময়দানে কার সাথে থাকতে চান। যার সাথে আপনি সময় কাটিয়েছেন তা কেমন ছিল? আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন তা যাচাই করে দেখেছেন কি? এমন নয় তো যে আপনি ভালোবাসার দাবি করছেন একজনের আর অনুসরণ করছেন আরেকজনকে?

কেউ আপনাকে বলল রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন বা করেছেন আর আপনি বলছেন অমুক হুজুর, নেতা, ইমাম, পীর সাহেব বলেছেন। এসবই আপনার সময় ব্যবস্থাপনার অংশ। একজনকে ভালোবাসার দাবি করে অন্যজনকে অনুসরণ করা অবশ্যই প্রতারণা।

মনোবিদরা এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা সময় নিয়ন্ত্রণের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পার্থক্য দেখিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপনি সর্বেসর্বা, নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। সেখানে আপনার মনকে যত বেশি সম্ভব কলুষতা মুক্ত রাখতে হবে। আর বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপনি নিয়ন্ত্রিত হবেন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দ্বারা।

আপনি বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের জায়গা থেকে চিন্তা করার বিষয়টি আমরা সচরাচর পাশ কাটিয়ে যাই। অনেক সময় অন্য কেউ আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করলে আপনি তাকে স্বাভাবিক মনে করেন, একে বলে দাস স্বভাব। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন নিজের অজান্তেই। এমন ক্ষেত্রে আপনি অনুভব করবেন যে আপনি আপনার বস, বিল কিংবা অহেতুক কাজের চাপ ও দায়িত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। আপনি অনুভব করবেন যে আপনাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ

করতে হবে। আপনার সময় ও আপনার জীবন আপনার অধীনে নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনি কেবল কলুর বলদের মতো খেটে মরছেন। বাহ্যিক ঘটনাবলির উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

নিউটনের সূত্রে যেমন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। আপনার টাইম ম্যানেজমেন্টেও বিষয়টি স্পষ্ট। আপনি আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করছেন; আর বাহ্যিক কোনো চাপে পড়ে প্রতিক্রিয়া করছেন; এ দুইয়ের মধ্যে কিন্তু বিস্তর ফারাক রয়েছে। একটি হচ্ছে আপনি ইতিবাচক অনুভব করছেন।

আপনার জীবন আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে। আর অন্যটি হচ্ছে আপনি চাপের মধ্যে আছেন, হতাশ ও নেতিবাচক অনুভব করছেন। আপনি যদি একজন দক্ষ ব্যক্তি হতে চান, কর্মক্ষম হতে চান তবে আপনার ব্যবসা ও ব্যক্তিগত জীবনের ওপর আপনাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। নিয়ন্ত্রণের যে অনুভূতি তা দৃঢ়ভাবে অনুভব করতে হবে।

হতাশাবাদী লোকদের সাথে থাকা এবং আপনার আকাঙ্ক্ষাকে গলা টিপে মেরে ফেলা কতটা ন্যায়সংগত? এগুলো থেকে দূরে থাকুন, কারণ তারা ভাইরাসের মতো, তারা আপনাকে কখনো না কখনো ফাঁদে ফেলবে।

'মানবজীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে তার 'মন এবং জবানকে' নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সমর্থ হওয়া।'

ইমাম গাজ্জালি

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই একটি নিজস্ব মতবাদ রয়েছে। একে বলে আত্মমতবাদ। একটি অভ্যন্তরীণ দর্শন, যার আলোকে পরিচালিত হয় তার প্রতিটি আচার আচরণ ও ব্যবহার। যেসব লোকজনের আত্মমতবাদ উঁচু, তারা মর্যাদাবান। এদের মধ্যে সময় টাইম ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা নিজেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি, গোছানো ও কর্মক্ষম, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সময় ব্যবহারের সার্থকতা লাভ করে।

'সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে বেশি ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।'

(সুরা তাওবা : আয়াত ১০৮)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক।'

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি তিনি অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। পবিত্রতা অর্জন ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

আপনার আত্মমতবাদ বা নিজের সম্পর্কে নিজের ধারণা যখন গঠিত করবেন তখন তা যেন হয় পবিত্র। সর্বোপরি বিশুদ্ধ। তবেই ইসলামের আলোকে গঠিত হবে আপনার বুদ্ধি, বিবেচনা, বিশেষ করে নিজের সম্পর্কে নিজের বিশ্বাস নিয়ে।

আপনি আপনার সময়কে কীভাবে কাজে লাগান সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে তারা চরমভাবে সাজানো গোছানো, পরিপাটি ও দক্ষ। আর অন্যরা কেমন ভয়াতুর, সামান্যতেই ভয় পায় এমন। তারা আশপাশের লোকজন ও পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

'মন্দ লোকের সঙ্গে যার ওঠা-বসা, সে কখনো
কল্যাণের মুখ দেখবে না।'
শেখ সাদি, ফারসি কবি

কয়েকটি প্রশ্ন আপনাকে অনবরত ভাবিয়ে তুলবে। এসব প্রশ্ন যতবেশি আপনার মনে আসবে ততবেশি আপনি সময় সম্পর্কে সচেতন হবেন-

১. আপনি কি নিজেকে একজন যোগ্য ও কর্মক্ষম ব্যক্তি রূপে দেখেন?
২. আপনার কর্ম ও জীবন কি আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে?
৩. আপনি যাই বিশ্বাস করবেন আপনি তাই হবেন।
৪. আপনি আপনার নিজের সম্পর্কে কী চিন্তা করেন?
৫. আপনি কি আপনার নিজের সময়কে দক্ষভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম?
৬. আপনি কি নিজেকে একজন সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে চিন্তা করেন?
৭. আপনার কল্পচক্ষুতে দেখেন?

যদি আপনি নিজেকে একজন দক্ষ সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি রূপে চিন্তা করেন তবে আপনি সংগতভাবেই সেই জিনিসগুলো করবেন যা আপনি বিশ্বাস করেন।

কারণ আপনার স্ব-মতবাদ আপনাকে অবিরতভাবে সংগতি বজায় রাখতে তাড়া দিয়ে যাবে। আপনি ভেতরে নিজেকে যেভাবে দেখেন, ঠিক সেভাবেই আপনি বাইরে কাজ করবেন। যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনি সময়কে ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন তবে আপনি অবশ্যই একজন দক্ষ সময় পরিচালক হবেন।

আপনি সময় পরিচালনার যত বই আছে সব পাঠ করতে পারেন, যত কোর্স আছে ও পদ্ধতি আছে তার সবগুলো প্রয়োগ করতে পারেন, তারপরও যদি আপনি কল্পনা করেন যে আমি একজন অদক্ষ সময় পরিচালক, ইঁচড়ে পাকা তবে কোনো কিছুতেই আপনার কোনো লাভ হবে না। আপনাকে অবশ্যই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে হবে।

৫
সময়ের করাল গ্রাসে জীবন হোক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

'তুমি যদি ভালো কিছুর জন্য প্রত্যাশা করো, পৃথিবীও তোমাকে তেমন প্রতিদান দেবে।'
শামস তাবরিজি, ইরানি সুফি

আপনি কি আত্মসম্মানের জীবনযাপন করতে চান?

আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিজেকে আপনার অতীতের শেকল থেকে মুক্ত করুন, নিজের সম্পর্কে শালীন উচ্চমত পোষণ করুন এবং একটি নতুন আলোকে নতুন জীবন শুরু করুন। কারণে অকারণে অযথা অজুহাত দেখা বন্ধ করুন।

ফলাফল আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে। সময় এসে আপনাকে ভবিষ্যতের সুসংবাদ দেবে। তাই আজই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন। সময়কে আপন নিয়ন্ত্রণে নিন।

প্রতিশ্রুতি : পরিবার/বন্ধু-বান্ধব/আত্মীয়স্বজন-এর প্রতি

এক জীবনে আপনি কতজন মানুষ চেনেন? কিংবা সারাজীবনে কতজন মানুষের সাথে আপনার পরিচয় হয়? মোটামুটি পরিচয় এমন মানুষও গণনায় নিলাম। তাহলে হাজার পাঁচেক হতে পারে। কিংবা দশ হাজার। এ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ৭০০ কোটি। তার মানে আপনি ০.০০০০০১% মানুষের সাথে পরিচিত। বাকি ৯৯.৯৯৯৯৯৯% মানুষের সাথেই আপনার পরিচয় হয়নি। কিংবা জানা হয়নি। আপনার জীবন ততটাই ছোট অবস্থানে আছে যতটা আপনি ভাবছেন। অথচ এই ছোট্ট সময়ে আপনি তিক্ততা হিংসা কিংবা ক্রোধ পোষণ করছেন।

কারো প্রতি আপনার হিংসা বিদ্বেষ কিংবা তিক্ততা জন্ম নিতেই পারে। কিন্তু তা ঝেড়ে ফেলুন। আর সব লজ্জা ফেলে এবার আপনিই উদ্যোগ নিন। আজ, এখনই এই মুহূর্তে আপনার এমন একজন আত্মীয়কে ক্ষমা করুন যিনি আপনাকে চিরশত্রু বলে মনে করছেন। কারণ আপনি সঠিক সময় এর ম্যানেজমেন্ট করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কী, পারবেন তো?

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্য। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষকে ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই ভালোবাসেন।'

(সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৪)

অপরের ভুলত্রুটি ক্ষমা করা এবং অন্যের অসদাচরণের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করা মুমিনের অনন্য একটি গুণ। এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ খুব সহজেই সবার প্রিয় হয়ে উঠতে পারে এবং আল্লাহর বিশেষ বান্দা হিসেবে মনোনীত হতে পারে। আল্লাহতায়ালা এই গুণ অর্জনে মানুষকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন।

বিখ্যাত সাহাবি আনাস (রা.) বলেন-

'আমি নবীজীর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তার পরনে ছিল একটি নাজরানি (ইয়েমেনি) চাদর, মোটা কাপড় বিশিষ্ট। এক বেদুইন তার কাছে এসে সেই চাদর ধরে সজোরে টান দিল। আমি দেখলাম মোটা কাপড়ের ঘষায় নবীজীর কাঁধে দাগ বসে গেল। লোকটি কর্কশস্বরে তাকে বলল, 'আল্লাহর যে মাল তোমার কাছে আছে তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলো!' নবীজী (সা.) লোকটির দিকে ফিরে তাকালেন এবং মুচকি হাসলেন। এরপর তাকে কিছু দেয়ার আদেশ করলেন।'

(বুখারি, হাদিস : ৩১৪৯)

কাউকে ক্ষমা করা, দুর্বল ব্যক্তি দ্বারা করা সম্ভব নয় কারণ এর জন্য সাহস প্রয়োজন এবং দুর্বল ব্যক্তির সর্বদা এই শক্তিটির অভাব থাকে। বিপরীতে ক্ষমা করা প্রমাণ করে যে আপনার সাহস আছে ও আপনি উদার।

নিচের বক্সে এখনি লিখে ফেলুন আপনি কাকে ক্ষমা করতে চান?

প্রতিশ্রুতি : যত্ন নেয়ার প্রতি

সময়ের সঠিক ব্যবহারের জন্য আপনার শারীরিক সুস্থতা অত্যন্ত জরুরি। যদিও আমরা এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উদাসীন। লেখক জোবায়ের রুবেল তার 'মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন' বইতে লিখেছেন-

মানুষের ব্রেন নামক প্রাকৃতিক কম্পিউটারও হ্যাং করে। বছরের পর বছর চলতে চলতে তার মধ্যেও কিছু সমস্যা দেখা দেয়।

যেমন- অহেতুক উত্তেজিত হওয়া, উদ্বেগ, ভয়, দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, অতিমাত্রায় দুঃখী হওয়া, আত্মবিশ্বাসের অভাব হওয়া এবং সুখী হতে না পারা। এসবই হচ্ছে মনের কোনো না কোনো সফটওয়্যারজনিত সমস্যা। যদি মনকে প্রতিদিন রিস্টার্ট দেন, তাহলে মনও আরো বেশি কর্মক্ষম, আরো প্রোডাকটিভ হয়ে ওঠে। তখন মন থাকবে আপনারই দখলে। মনকে একটি যন্ত্র হিসেবে আপনার দরকারমতো ব্যবহার করতে পারবেন।

যেমন, আপনার যখন হাঁটার দরকার হয় তখন আপনি পা ব্যবহার করেন। যখন কোনো কাজ করার দরকার হয়, আপনি হাত ব্যবহার করেন। বাকি সময় আপনার হাত-পা বিশ্রাম নেয়। যদি আপনার হাত-পা আপনার অনুমতি ছাড়াই চলতে পারত? তাহলে আপনার কী দশা হতো? একবার ভাবুন তো?

তখন অবশ্যই আপনি ডাক্তারের কাছে যেতেন এবং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যখন সমস্যাটা মনের তখন আমরা নিজে থেকে সেটা বুঝতে পারি না। আমরা ভাবি এটা তো এমনই। আপনি যদি প্রতিদিন একবার নিজেকে রিস্টার্ট দেন তাহলে আপনার কাছে সবকিছু জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে, কোনটা সমস্যা আর কোনটা আপনার বানানো সমস্যা।

প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে রিস্টার্ট দেবেন? উত্তরটা খুব সহজ, মাইন্ডফুলনেস অনুশীলনের মাধ্যমে!

পশ্চিমা ডাক্তাররা এখন চিকিৎসার পাশাপাশি মাইন্ডফুলনেস অনুশীলনের পরামর্শ দিচ্ছেন। কারণ, মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন অনুশীলন আমাদের প্রতিযোগিতাপূর্ণ চাহিদাগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। আমাদের চিন্তাভাবনাগুলোকে কেন্দ্রীভূত করে, ফলে আমরা পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারি। এটি আমাদের দুশ্চিন্তা, ভয় ও চাপ কমায়, ভালো ঘুমের ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। আমাদের প্রোডাকটিভিটি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়, দ্রুত, সঠিক ও প্রো-অ্যাকটিভ চিন্তা করতে সাহায্য করে।

মাইন্ডফুলনেস আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলোতে অভ্যাসগতভাবে প্রতিক্রিয়া না করে সচেতনতার সাথে প্রতিক্রিয়া বা প্রো-অ্যাকটিভ হওয়ার মাধ্যমে আরো সঠিক বিকল্প খুঁজে নিতে সাহায্য করে। শুধু এটুকুই নয়, মাইন্ডফুলনেস আমাদের পুরোপুরি সুখী করার সক্ষমতা রাখে।

মোদ্দা কথা হলো সময়কে সঠিক ব্যবহারের মধ্যে আনতে হলে অবশ্যই আপনার সুস্থতা জরুরি। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের শরীরটি প্রথম অবহেলিত। আপনি যদি এর যত্ন না নেন, তবে অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য আপনাকে ভারী মূল্য দিতে হবে। মানুষের এই জটিল কাঠামোর জন্য কত ব্যয় হবে তা নিয়ে গবেষণা করছেন ইউকে ও জার্মানির বিজ্ঞানীরা। আপনি জেনে অবাক হবেন যে, অনুমানটি শুধু অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে ব্যয় ৮ কোটি ডলার অতিক্রম করেছে। তাই সময়ের সাথে নিজেকে অভ্যস্তত্ম করুন সঠিক নিয়মে।

সুস্থতার কিছু সাধারণ অভ্যাস-

- ❖ সকালে ওঠার অভ্যাস করুন।
- ❖ তাড়াতাড়ি বিছানায় যান।
- ❖ ৩০ মিনিট প্রতিদিন হাঁটুন।
- ❖ সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময় মেডিটেশন করুন।
- ❖ জাঙ্ক ফুড ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করুন।

আপনার জীবনকে আরো ভালোভাবে উপভোগ করতে শরীরের জন্য আপনি কী করতে পারেন? কীভাবে তা নিজের মধ্যে নেবেন? এখনি একটা ডিসিশন নিন। নিচে ডিসিশনটি লিখে ফেলুন-

প্রতিশ্রুতি : অন্তত একটি বদভ্যাস ত্যাগের প্রতি

জীবনকে আপনি প্রোডাকটিভ করতে চাইছেন। প্রতিটি সময় করে তুলতে চাইছেন মূল্যবান। তাহলে বদভ্যাস ত্যাগ করুন। বিশেষ করে কমন বদভ্যাসগুলো একেবাই আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু তা আপনার এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর। ধরুন আপনি যেখানে সেখানে থুথু ফেলেন। এটা একেবারে স্বাভাবিক আপনার কাছে। এটা কোনো ব্যাপারই নয়। তবে এর মাধ্যমে কঠিন কোনো রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সাহাবি হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাজিয়াল্লাহুর সূত্রে বর্ণিত হাদিসে হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

'যে অন্যের ক্ষতি করে আল্লাহ তার ক্ষতি করেন এবং যে অন্যের শত্রুতা করে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেন।'

সুনানে আবু দাউদ : ৩৬৩৫

সুতরাং মুমিনের উচিত নিজেকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং অন্যকেও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু আমরা বিষয়টাতে একেবারে উদাসীন। আমরা যেখানে সেখানে প্রস্রাবও করি।

আপনাকে বিনীতভাবে বলি যে, কমপক্ষে একটি খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করার চেষ্টা করুন। এটি যেকোনোটি হতে পারে- মদ্যপান, ধূমপান, আসক্তি, তামাক, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা বা প্রস্রাব করা, কফ-কাশি ফেলা, কারণ ছাড়াই মিথ্যা কথা বলা, নোংরা ভাষা ব্যবহার করা, খোঁড়া অজুহাত তৈরি করা ইত্যাদি।

আপনি যদি ঘোষণা করেন যে আপনার কোনো বদভ্যাস নেই, তবে তা নতুন কোনো মিথ্যে। আপনি বরং আপনার লাইফস্টাইল নতুন করে বিশ্লেষণ করুন। বদভ্যাসগুলো খুঁজে বের করুন। নিচে লিখে ফেলুন আজই কোন বদভ্যাসটি বাদ দিতে চান?

প্রতিশ্রুতি : মাসে অন্তত একটি বই পড়ার অভ্যাসের প্রতি

সৈয়দ মুজতবা আলীর 'বইপড়া' গল্পটা সবাই জানি। বাঙালি হিসেবে আপনি বিষয়টা পড়ে রোজই মজা পেতে পারেন। তবে নিজেকে প্রশ্ন করুন? এভাবেই কি জাতি হিসেবে বইবিমুখ থাকব আমরা? কিংবা আমরা বদলাব কবে? নাকি ভাবছেন সবাই বদলানোর পর আপনি বদলাবেন?

যদি ভেবে থাকেন সবাই বদলানোর পর বদলাবেন তাহলে আর কোনোদিনই বদলানো হবে না। বরং ভাবুন, আপনি বদলালেই অন্যরা বদলাবে।

বই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভেবে দেখুন এ পৃথিবীর মানুষ কীভাবে চলবে? তার চলার সকল নিয়মকানুন সৃষ্টিকর্তা পাঠিয়েছেন বই হিসেবে। তাই এর মর্যাদা যে জাতি বোঝেনি সেই জাতি পিছিয়েই থাকবে। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে ছোট্ট একটা পরিসংখ্যান দেখে নিই-

বইপড়ুয়া জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে স্থান করে নিতে চলেছে ভারতীয়রা। শীর্ষ বইপড়ুয়া জাতির তালিকায় টানা দুই বছর ধরে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে প্রতিবেশী এই দেশের মানুষ।

গত বছর ভারতের মানুষ সপ্তাহে ১০ ঘণ্টা ৪২ মিনিট ব্যয় করেছে বই পড়ার পেছনে। বলা ভালো, ১২০ কোটি জনসংখ্যার দেশে জনসংখ্যার আধিক্যের কারণেই ভারতীয়রা বই পড়ার দিক থেকে এগিয়ে থাকবে, এটা স্বাভাবিক। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ওখানে সাক্ষরতার হার কম হলেও যারা মোটামুটি শিক্ষিত, তারা বই পড়ার পেছনে বেশি সময় ব্যয় করেন। এই জরিপ অন্তত সেটাই প্রমাণ করে। ভারতের পরের অবস্থানে রয়েছে থাইল্যান্ড। তারা ব্যয় করেছে ৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে চীন। চীনের মানুষ বই পড়েছে সপ্তাহে ৮ ঘণ্টা। এই

তালিকায় বাংলাদেশের কোনো নাম নেই। তবে তালিকার একেবারে পাদদেশে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নাম। হ্যাঁ, মার্কিনিরা সবচেয়ে কম সময় ব্যয় করেছে বই পড়ার পেছনে- মাত্র ৫ ঘণ্টা ৪২ মিনিট।

শিক্ষার হারের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে সিঙ্গাপুর। দেশটির সাক্ষরতার হার ৯৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ। এ দেশের মেয়েরাও বই পড়ার দিক থেকে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে। শতকরা ৭৫ ভাগ মেয়ে বই পড়েন, অন্যদিকে ছেলেদের হার ৫৯ শতাংশ।

২০২০ সালে সবচেয়ে বেশি বই ছেপেছে চীন। এক বছরে ছেপেছে ৪ লাখ ৪০ হাজার বই। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা ছেপেছে ৩ লাখ ৪ হাজার ৯১২টি বই। তৃতীয় অবস্থানে আছে যুক্তরাজ্য, ছেপেছে ১ লাখ ৮৪ হাজার বই। ভারতের মানুষ বই পড়ার দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও বই ছাপার দিক থেকে খানিকটা পিছিয়েই আছে। তালিকায় ভারতের অবস্থান সপ্তম। তারা গত বছর বই ছেপেছে ৯০ হাজার।

বই পড়ার বিষয়ে ইসলাম কী বলে?

মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত 'ওহি' অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের প্রথম পাঁচ আয়াতই হচ্ছে পাঠ করা কিংবা জ্ঞানার্জন সম্পর্কে। আল্লাহ বলেন-

'পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন...'

(সুরা আলাক)

এর মধ্যে প্রথম বাণীটিই হলো 'ইকরা' অর্থাৎ 'পড়ো'। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনের অন্তত ৯২ জায়গায় জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রসঙ্গ এনেছেন।

আপনি জানেন কি 'আল কোরআন' শব্দটির একটি অর্থ 'অধ্যয়ন'।

জ্ঞানই মানুষকে আল্লাহভীরু করে তোলে। পবিত্র কোরআনে যেসব দৃষ্টান্ত রয়েছে, তা অনুধাবনের জন্যও জ্ঞানী হওয়া প্রয়োজন। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেন-

'আর এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য উপস্থাপন করি আর জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া কেউ তা বুঝে না।'

(সুরা আনকাবুত : ৪৩)

যে জানে এবং যে জানে না এই দুই ব্যক্তি সমান হতে পারে না। আল্লাহতায়ালা বলেন-

'বলো, যারা জানে আর যারা জানে না
তারা কি সমান হতে পারে?'

(সুরা জুমার, আয়াত : ৯)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।'

(ইবনে মাজাহ)

অথচ আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করি বই পড়া অযথা সময় নষ্টের ব্যাপার। বিশেষ করে সৃজনশীল বই পড়া মানে গোল্লায় যাওয়া, উচ্ছন্নে যাওয়া। এমন বাবা-মাও আছেন যারা পাঠ্যবইয়ের বাইরে সন্তানদের পড়তে দিতে চান না। এতে আমরা শিক্ষিত হই বটে, তবে সভ্য হই না। সহজ বাংলায় বললে 'সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কেবল বাড়ছে, প্রকৃত ভদ্র মানুষ গড়ে উঠছে না'।

জ্ঞানীরা বই পড়ার বিষয়ে নানান কথা বললেও জাতি হিসেবে আমরা তা আমলেই নিচ্ছি না। আপনি বই পড়া ছাড়া, সভ্য শিক্ষিত হওয়া ছাড়া আপনার জীবনের টাইম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করবেন?

ভেবেছেন কি কখনো?

এই পৃথিবীর অনেক জায়গা থেকে আপনি প্রতারিত হতে পারেন, তবে আপনি অর্জিত জ্ঞান দ্বারা কখনই প্রতারিত হবেন না।

একজন মূর্খ ব্যক্তি তার নিজের ভুল দ্বারা সবকিছু শেখে, কিন্তু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যের ভুল থেকে শেখেন এবং সেগুলো কখনো পুনরাবৃত্তি করেন না। টাইম ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে সফল হওয়ার প্রধান উপায় হলো সফল ব্যক্তিদের সম্পর্কে পড়া ও তাদের মতো কাজ করা।

দয়া করে প্রতি মাসে একটি ভালো বই পড়ুন। একজন সফল ব্যক্তির লেখায় আপনার জীবনে এক গভীর পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রয়েছে। আমি এই সত্যের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে বইগুলো আসলে মানুষকে রূপান্তরিত করে শুদ্ধ মানুষ হিসেবে। সুতরাং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, আপনার পছন্দের একটি বই নির্বাচন করুন যা আপনি এই মাসে পড়বেন। বইটির নাম লিখে ফেলুন-

প্রতিশ্রুতি : আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের প্রতি

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য সময় ব্যয় করুন। এই ব্যয় করা সময় ঘরে নয়, বরং মসজিদে কাটান। আপনার কাটানো সময়ের মধ্যেই আপনার মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাটারি রিচার্জ হবে। এই সময় আপনার মনের অনেক দুঃখের কথা যা কোনো বন্ধুকেও বলতে পারেননি তা মহান আল্লাহতায়ালার সাথে শেয়ার করুন।

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ স্থান মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান বাজার। এ কারণে মানুষ যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করে অন্তত ততক্ষণ যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। আর মসজিদে অবস্থানের এ ধারা অব্যাহত থাকলে মানুষের দ্বারা সমাজে সংঘটিত নানাবিধ খারাপ কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। আর তাতে শান্তির সমাজ সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে মসজিদে অবস্থান বা বসে থাকার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। ঘোষণা করেছেন অনেক ফজিলত-

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

'কোনো বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজ আদায়ের স্থান (জায়নামাজে) নামাজের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পুরো সময়ই নামাজে থাকে। (মসজিদে থেকে) তার প্রত্যাবর্তন না করা অথবা ওজু ছুটে না যাওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে।'

(মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

প্রতিশ্রুতি : দিনে অন্তত একজন ব্যক্তির প্রশংসা

বিশ্বের বৃহত্তম পুরস্কার প্রশংসা করা। একটি নতুন সম্পর্ক তৈরির সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। কারো প্রশংসা করে, আমরা বন্ধুদের কাছে অপরিচিত ব্যক্তিকে পরিণত করতে পারি, তবে বেশিরভাগ লোক কীভাবে প্রশংসা করতে হয় জানে না। এ জাতীয় লোকেরা একটি ছোট সামাজিক চেনাশোনাতে চলে আসে এবং তাদের অগ্রগতির হার যথেষ্ট কম।

যদিও ইসলাম মানুষের প্রশংসা বা সমালোচনা উভয় ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ মূলত সকল প্রশংসা মহান আল্লাহতায়ালার জন্য। তাই ব্যক্তিপ্রশংসার ব্যাপারে সীমারক্ষা করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-ও তার সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন-

'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসুল।'

(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৪৪৫)

অন্যদিকে আত্মপ্রশংসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। যদিও আমরা জীবনের অনেকটা সময় সুযোগ পেলেই নিজের প্রশংসায় ব্যস্ত হয়ে যাই। আমি এই পাড়ি সেই পাড়ি- নিজেকে জাহির করা ছাড়া যেন কিছুই ভাবতে পারি না। ভেবে দেখুন আমরা এসব নিষিদ্ধ কাজে কতটা সময় নষ্ট করি? মহান আল্লাহ বলেন-

'অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা কোরো না,তিনিই সম্যক জানেন কে আল্লাহভীরু।'

(সুরা : নাজম, আয়াত : ৩২)

'দুনিয়াতে সবচেয়ে বোকা ও নির্বোধ সে, যে নিজের পবিত্রতা দাবি করে এবং নিজেই নিজের প্রশংসা করে।'

ইমাম গাজ্জালি

কারো অতি প্রশংসা করা ইসলামে নিন্দনীয়। তাই এ বিষয়ে সময় নষ্ট করার আগে সাতবার ভাবুন। কারণ আমরা কোনো না কোনোভাবে নিচের তিন বিষয়ে আমরা অনেক বেশি সময় নষ্ট করি-

১. যে ব্যক্তি প্রকাশ্য পাপাচারে লিপ্ত, তার প্রশংসা করা যাবে না।
২. যে মানুষের ওপর অত্যাচার করে তার প্রশংসা করা নিষিদ্ধ।
৩. কোনো ব্যক্তির ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে শুধু তার প্রশংসা করা বা কারো চাটুকারিতায় লিপ্ত হওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ।

অন্যদিকে অতি প্রশংসার মুখোমুখি হলেও আপনার কিছু করণীয় আছে। এসব ক্ষেত্রে প্রশংসামূলক কথায় মুগ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোরআনের সতর্কবাণী রয়েছে-

'আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে
যা আছে সে সম্পর্কে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে।
প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।'

(সুরা বাকারা, আয়াত : ২০৪)

মহানবী (সা.) বলেন-

'যখন তোমরা কোনো অতি প্রশংসাকারীর মুখোমুখি হবে, তখন তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।'

(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩০০২)

৬
সিদ্ধান্ত নিন নতুন আলোর

'মানুষের হক সম্পর্কে যে সচেতন নয় সে আল্লাহর হক সম্পর্কে সে কখনোই সচেতন হতে পারে না।'

হযরত উসমান (রা.), তৃতীয় খলিফা

মানুষের দুঃখের সময়গুলোর খুব পবিত্র একটি উদ্দেশ্য আছে। আমাদের ক্ষতির সময় অর্থাৎ বিপদের সময় আমরা প্রকৃত কৃতজ্ঞতা অনুভব করি। আমরা প্রত্যেকে বিপদে কৃতজ্ঞ হই। সমস্যা হলো সেই বিপদের সময় আমরা দ্রুত ভুলে যাই।

আমরা এই জীবনের প্রতি অদ্ভুত অকৃতজ্ঞ মেঘ দ্বারা বাস্তবতার সূর্য থেকে আবৃত। আমরা যদি আমাদের জীবনকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করতে শিখি তাহলেই কেবল সচেতনতার আলো আমাদের চেতনাকে বিদ্ধ করে, সত্যকে উন্মোচন করে।

আপনার দৈনন্দিন অবহেলিত সময় ব্যয়

আপনি যদি সভা ও সাক্ষাৎকারের জন্য বা কারো সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় কি দেরি করে যান? এটাই যদি অভ্যাস হিসেবে নিজের মধ্যে তৈরি করে ফেলেন বা চিন্তা করেন যে আমি একজন অগোছালো ব্যক্তি তবে আপনার এই অভ্যাসগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আপনার আচরণে পরিণত হবে। এটা আপনার অবহেলার ফল। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে আপনি এটা বুঝতেও পারবেন না।

যদি আপনি আপনার বিশ্বাস পরিবর্তন না করেন আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা না করেন যে আমি আমার কাজে একজন দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি হব, তবে আপনি আপনার সময়কেও দক্ষভাবে পরিচালিত করতে সমর্থ হবেন না। সবকিছুই আগের মতো থাকবে, কিছুই বদলাবে না।

একটি সিদ্ধান্ত নিন

আপনি কি সময়ের ব্যাপারে উদাসীন? কোনো সভা-সমাবেশ বা মিটিংয়ে সময়মতো উপস্থিত হন?

প্রশ্নটার উত্তর নিয়ে এবার অন্তত ১০ সেকেন্ড ভাবুন। উত্তর যদি ইতিবাচক না হয় তাহলে আপনি কীভাবে নতুন ও ইতিবাচক অভ্যাস গঠন করবেন? নিজের বিশ্বাসও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবেন? আশার কথা হচ্ছে এটা তেমন কঠিন কিছু নয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সময়নিষ্ঠ হওয়ার অভ্যাস গঠনের জন্য একটি সিদ্ধান্ত নিন। আজ থেকে সামনে কোনো সভা বা কারো সাথে সাক্ষাৎ থাকলে একটু আগে যান। একজনের জীবনে পরিবর্তন তখনই আসে যখন সে ভিন্ন কিছু করার জন্য দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়। একজন দক্ষ সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ার প্রতি প্রথম ও প্রধান ধাপ হচ্ছে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া।

'অভ্যাস হলো মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যা বাকি পাঁচটিকে ভুল প্রমাণ এবং বশীভূত করতে পারে।'

-আরব প্রবাদ

প্রোগ্রাম করে ফেলুন নিজের মনকে

আজ থেকে আপনি কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন যে আপনি একজন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তি হবেন। যদি তাই হয় তবে নিজেকে নতুন করে প্রোগ্রামিং করুন। সে অনুযায়ী নিজেকে সময়ের সাথে তালে তাল মিলিয়ে নিন। এর জন্য যা যা দরকার তা আপনি চর্চা করুন।

আপনার লক্ষ্য ও কাজের মোট বিন্যাস সম্পর্কে আপনার জানা উচিত। অনেকেই ছোটখাটো সুযোগকে নিকৃষ্ট বলে ফেলে দেয়। কিন্তু মনে রাখবেন সময় আপনাকে অনেক সুযোগ দেবে। আর কোনটা সুযোগ বড় আর কোনটা ছোট তা আপনি আমি কেউ বলতে পারি না। তাই ভুলেও আরো বড় সম্ভাবনার জন্য অপেক্ষা করা বোকামি। যদিও অনেকে দুর্ভাগ্যক্রমে তারা শেষ অবধি অপেক্ষা করতে থাকে।

যদি আপনি এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করতে চান তবে গাছের বৃদ্ধির জন্য তাকে পুরো কাঠামো নিয়ে ভাবতে হবে। যেমন : জমি বাছাই, বীজ বপন, প্রতিদিনের সেচ ও সার ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা যখন ধাপে ধাপে এগিয়ে যাই, তখন মাথায় রাখবেন কোনো গন্তব্যই মসৃণ নয়। প্রায়ই আমাদের গন্তব্যটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হবে। আপনি তখন মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। এতে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সুতরাং প্রথম পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত থাকুন, তারপর ও পরবর্তী তৃতীয় এবং পুরো পথে এগিয়ে যান। যদি মনে হয় কাজটি গুরুত্বপূর্ণ, তবে অপেক্ষা করবেন না। দ্বিধা ছেড়ে, আল্লাহকে স্মরণ করুন, বড়দের আশীর্বাদ নিন, নিজেকে বিশ্বাস করুন।

জীবন এবং সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, জীবন শেখায় সময়কে ভালোভাবে ব্যবহার করতে, সময় শেখায় জীবনের মূল্য দিতে।

-এপিজে আবুল কালাম

আসুন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নজর দিই। প্রথমে আপনার অভ্যন্তরীণ বক্তব্য বদলাতে হবে। আপনার কাজ, আপনার অনুভূতি বা আপনি যেভাবে আচরণ করেন তার অন্যতম কারণ আপনি সেভাবে মনে মনে নিজের সাথে কথা বলেন আপনার কাজকর্মের পঁচানব্বই শতাংশ ভাগ এই নিজের সাথে নিজের যে আলাপ তার ওপর নির্ভর করে। বারবার নিজেকে বলুন-

১. আমি সাজানো গোছানো, পরিপাটি ও কর্মক্ষম একজন।
২. আমি অতিরিক্ত কাজের চাপ নেয়া ক্ষমতা রাখি। কারণ আমি সময়ের ব্যবহার জানি।
৩. আমি একজন সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি।
৪. আমি একজন দক্ষ সময় পরিচালক।

আপনার অবচেতন মন এই শব্দগুলোকে গ্রহণ করে নেবে। আপনার মন এই শব্দাবলিকে নির্দেশের মতো পালন করবে এবং আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে আপনাকে প্রকৃতপক্ষে, বাস্তব জীবনে ঠিক সেইভাবে, পরিপাটি ও কর্মদক্ষ হিসেবে কাজ করতে তাড়া দেবে। আপনার আচরণ ও কাজ হবে সাজানো গোছানো।

'হে খোদা আমার অন্তরের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে দাও যেন আমার দৃষ্টির আলো সবার ওপর হয়।'

আল্লামা ইকবাল

কল্পচোখে নিজেকে দেখুন

ধরুন আপনি একজন সিইও। আপনি কীভাবে ভাববেন? মাসটা কোনোভাবে পার হলেই মোটা অঙ্কের বেতন পাব? নাকি নিজের মধ্যে স্কিল বাড়াবেন। সময়ের সাথে সাথে নিজেকে আরো যোগ্য করে তুলবেন? আপনার আচরণকে পরিবর্তন করার আরেকটি উত্তমপন্থা হচ্ছে কল্পচোখে নিজেকে একজন দক্ষ সময় ব্যবস্থাপক হিসেবে দেখা।

আপনি নিয়মতি নিজেকে দেখুন একজন সংগঠিত, পরিপাটি ও দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে। চিন্তা করুন যে আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণে আপনি মহান আল্লাহর সাহায্য এবং সহযোগিতা অবশ্যই পাবেন। কারণ আপনি আপনার অন্তরকে শুদ্ধ করতে পেরেছেন। সময়ের সাথে চিন্তার ধারণাকে সেরা করে তুলেছেন। স্মরণ রাখবেন, আপনি অভ্যন্তরে যে ব্যক্তিকে 'দেখতে' পাবেন ঠিক তাকেই বাহ্যিকভাবে 'পাবেন'।

আপনি যদি আগে থেকেই একজন পরিপাটি ও দক্ষ ব্যক্তি হন তবে আপনি এখন কী করবেন? আপনি আপনার আচরণে আর কী ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনবেন? নাকি ভেবে নেবেন আপনার আর কোনো কিছুই করার নেই?

নিজের ভেতরে নিজের একটি শান্ত, আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষ ছবি আঁকুন। নিজেকে আরো ছেড়ে দিন। এতে করে আপনি অনেক পরিমাণ কাজ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই করতে পারবেন।

একজন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির কথা চিন্তা করুন তো। তার টেবিলটি বা কাজের ডেস্কটি কি অপরিষ্কার বা অগোছালো? লোকটি কি চাপমুক্তভাবে উপস্থিত হয়? নিজের ভেতরে নিজের এমন একটি মানসিক চিত্র আঁকুন যে তার জীবন ও সময়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। আপনার কাজের টেবিলের দিকে রোজ লক্ষ করুন। যদি রোজই অগোছালো থাকে তবে আপনি অবশ্যই সময়ের সঠিক ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত নন।

'তুমি বদ, লোকে বলে সৎ- ইহা অপেক্ষা তুমি সৎ, লোকে বলে বদ, ইহা ভালো।'

শেখ সাদী

'যেন' আচরণ

নিজেকে প্রোগ্রাম করার তৃতীয় পন্থাটি হচ্ছে 'যেন' আচরণ। এমন আচরণ করুন যেন আপনি ইতিমধ্যেই একজন দক্ষ সময় ব্যবস্থাপক হয়ে গেছেন। এমনভাবে নিজেকে চিন্তা করুন যেন আপনি যা কিছুই করুন না কেন স্পষ্ট ভালোভাবে গুছিয়ে করছেন। যেন আপনি আপনার সময়কে চমৎকারভাবে পরিচালিত করছেন। আপনি যদি একজন দক্ষ সময় ব্যবস্থাপক হতেন তবে কীভাবে কাজ করতেন? আপনি আলাদা কী করতেন? আপনি আপনার সময় ও ব্যক্তিগত আগ্রহ উৎসাহ নিয়ে এখনকার চেয়ে ভিন্ন এমন কী করতেন? ঠিক তেমনটাই চিন্তা করুন। দেখবেন ঠিক তদনুরূপ আপনি কাজও করছেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আজকে যদি আপনি নিজেকে একজন দক্ষ সময় ব্যবস্থাপক রূপে চিন্তা নাও করেন, কেবল ভান ধরেন তবুও দেখবেন আপনি আপনার কাজের মধ্যে এক ধরনের

শৃঙ্খলা ও দক্ষতা অনুভব করছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি আপনার কাজ, অভ্যাস ও আচরণকে পরিবর্তন করতে পারেন যদি আপনি 'অন্ততপক্ষে তা করার প্রতি ভানও ধরেন'।

নিজের আচরণ আপনার নিজেকেই গঠন করতে হবে। কারণ আচরণের মাধ্যমে আপনার বাহ্যিক পরিচয় প্রকাশ পায়। আগামী সময়ে মানুষ আপনাকে কীভাবে গ্রহণ করবে তা নির্ভর করবে। আপনার আচরণ এমন হবে যা আপনি নিজের জন্য ভাবেন তা অন্যের জন্যও ভাবতে হবে। তবেই আপনি সফলতা লাভ করবেন।

এই ভাবনা কেমন হতে পারে?

আসুন আমরা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর জীবনের একটি ঘটনা থেকে তা শিখে নিই-

কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন হযরত ফাতেমা (রা.)। হযরত আলী (রা.) সঙ্গে বিয়ের পর তার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় রাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই একজন ভিক্ষুক তার দরজায় কড়া নাড়লেন। ভিক্ষুক তার কাছে একটি পোশাক চাইলেন? ফাতেমা (রা.) ভিক্ষুককে তার পুরনো পোশাক দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তার মনে পড়ল কোরআনের সেই আয়াতের কথা-

'তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।'

(সুরা আল-ইমরান, আয়াত-৯২)

ফাতেমা (রা.) তাই নিজের জন্য পুরনো পোশাকটি রেখেছিলেন এবং নতুন বিয়ের পোশাক (গাউন) ভিক্ষুককে দিয়েছিলেন। এটি আল্লাহর ভালোবাসা এবং উদারতার সত্যিকারের প্রতিনিধি হওয়ার একটি উদাহরণ। এই উদাহরণ কোনো শর্ত বা পার্থিব সংযুক্তি ছাড়াই।

ফাতেমা জাহরা (রা.) কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব অর্থাৎ 'যেন' আচরণে অভ্যস্ত হননি। তিনি কোনো যুক্তি খোঁজেননি। তিনি জানতেন-

'আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দেন, যারা তাদের ভালোবাসার মধ্যে থেকে চিরকালীন পুরস্কার এবং এমন মুনাফা যা কখনো ধ্বংস হবে না।'

(সুরা ফাতির, আয়াত-২৯)

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসুলুল্লাহ সা.-এর প্রত্যক্ষ সঙ্গী। কুরআনের যেকোনো নির্দেশ পালনের জন্য তারা ছিলেন উন্মুখ। ফাতেমা জাহরা (রা.) এর মতো তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহায় সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোনটি তাদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর আল্লাহর পথে তা ব্যয় করার জন্যে তারা রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে আবেদন করতে লাগলেন।

মদীনার আনসারগণের মধ্যে আবু তালহা রা. বেশ ধনী ছিলেন। মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তার একটি বাগান ছিল, যাতে 'বীরাহা' নামে একটি কুপ ছিল। বর্তমানে মসজিদের নববীর বাব আল মাজীদ্দীর বাদশাহ ফাহদ গেট দিয়ে ভিতরে মসজিদে প্রবেশের পর পরই সামান্য বাম পার্শ্বে এ স্থানটি পড়ে। পরিচিতির সুবিধার্থে দুই থামের মাঝখানের তিনটি গোল চক্কর দিয়ে তার স্থান নির্দেশ করা আছে। রাসুলুল্লাহ সা. মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন এবং বীরহা কুপের পানি পান করতেন। এ কুপের পানি তিনি পছন্দও করতেন।

আবু তালহার এ বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর এবং তার বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি বললেন, আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বীরহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি এটি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে চাই। তিনি রাসুল সা.-কে বলেন, আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই খরচ করুন। রাসূল সা. বললেন, বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে তুমি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা এ পরামর্শ গ্রহণ করেন।

(বুখারী: ১৪৬১, মুসলিম: ৯৯৮)

৭
আপনার ঐশ্বরিক মূল্যবোধ নিশ্চিত করুন

'যার প্রচুর আছে সে তার প্রচুর থেকে ব্যয় করুক।
আর যার রিজিক পরিমাপ করা হয় সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছে তা থেকে ব্যয় করে। আল্লাহতাআলা যা দিয়েছেন তাছাড়া অন্যের জন্য কোনো আত্মার মূল্য নেন না। আল্লাহ কষ্টের পরে স্বাচ্ছন্দ্য আনবেন।'

(সুরা আত-ত্বলাক্ব, আয়াত-০৭)

প্রকৃতপক্ষে সময় ব্যবস্থাপনা হচ্ছে জীবন ব্যবস্থাপনা। আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে চান তবে এটার সূচনা করতে হবে আপনার মূল্যবোধ থেকে।

ঐশ্বরিক আলো দিয়ে আপনার হৃদয়কে পূর্ণ করুন। আল্লাহর আলো পেতে কেমন লাগে তা আপনি ছড়িয়ে দিন। কারণ আমাদের আসক্তি আমাদের দাস করে। মহান আল্লাহ কেবল আমাদের সেই জিনিসগুলো ছেড়ে দেয়ার জন্য আহ্বান করেন যা আমাদের ভার দেয়। আমরা অলসতায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হই এবং আমাদের সত্যিকারের মুক্ত হতে বাধা দেয়। আপনি আপনার সময়কে ঠিকঠাকভাবে কাজে লাগাতে পারবেন না যদি না আপনি জানেন যে আপনার মূল্যবোধ কী। মূল্যবোধ মানে একজন যে নীতি বা আদর্শের ওপর ভিত্তি করে আচরণ করে, যার ওপর ভিত্তি করে একজন বিচার করে যে তার জীবনে কী বা কোনটা গুরুত্বপূর্ণ।

ভালো সময় ব্যবস্থাপনার জন্য যেসব জিনিসগুলো দরকার হয় তা হচ্ছে আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে ঐক্যতান থাকতে হবে। যদি এ জিনিসগুলো আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে না হয়, তবে আপনি কখনোই আপনার সময়কে নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো দৃঢ়তা ও উৎসাহ বোধ করবেন না।

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন-

১. আমি কেন এই কাজটি করছি?

২. কেন আমি ভোরে ঘুম থেকে উঠছি বা উঠতে চাই?

৩. আমি যেখানে কাজ করছি সেখানে কাজ করার কারণ কী?

উত্তরে কোনো ঐশ্বরিক আওয়াজ কি পান? যদি না পান তবে আপনার অতীত সময় আপনার সাথে প্রতারণা করেছে। আপনার সময় আপনাকে ভুল পথে টানছে।

প্রতিটি ব্যক্তির জীবনেই তার নিজস্ব জীবনের একটি তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য দরকার। ব্যক্তিগত হতাশা ও দুঃখী জীবনযাপনের পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে যে কাজগুলো করছি তার কোনো তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য না থাকা। এতে করে আপনার অভ্যন্তরীণ নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না এবং মূল্যবোধ অনুযায়ী কোনো উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না। আপনাকে তাই যেকোনো কাজ আরম্ভ করার শুরুতেই নিজেকে জিজ্ঞেস করা উচিত-

'কেন? আমি কেন কাজটি করব?'

আপনি সময় ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো প্রয়োগ করে নিঃসন্দেহে আরো দক্ষ ও কর্মক্ষম হবেন। কিন্তু এমন কাজে দক্ষ হয়ে লাভ কী যেটা আপনার কাছে কোনো মূল্যই রাখে না। এতে করে এই বাড়তি দক্ষতা কেবল আপনার বিচ্ছিন্নতা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে।

'অতীত আমাদের মনে ঘন কুয়াশার মতো। আর ভবিষ্যৎ? সম্পূর্ণ একটা স্বপ্ন। আমরা ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা ধারণাই করতে পারি না, যেমন পারি না অতীতকে বদলে দিতে।"

শামস তাবরিজি, ইরানি সুফি

এরপর আপনার নিজেকে আবার প্রশ্ন করুন-

১. আপনি আপনার জীবনে সবচেয়ে বেশি কিসের মূল্য দেন?

২. আপনি আসলে কিসের প্রতি মনোযোগী?

৩. আগামীতে আপনি কোথায় দাঁড়াতে চান?

আপনি কেবল তখনই সত্যিকার অর্থে সুখী হবেন, মূল্যবান ও পূর্ণতা অনুভব করবেন যখন আপনার আজকের কাজ, মানে প্রতিদিনকার কাজ আপনার নীতি ও আদর্শের সাথে সংগতি রেখে চলবে। প্রায় সব হতাশা, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও মানসিক চাপ আরম্ভই হয় যখন আপনি বিশ্বাস করেন একটার আর মূল্য দেন আরেকটার।

অনেক সময় আমরা দেখতে পাই কাজের চাপে অনেকেই চাকরি ছেড়ে দেয়। কিন্তু যেসব মানুষ তাদের কাজকে ভালোবাসে এবং তাদের পূর্ণ হৃদয় দিয়ে কাজ করে, তা করে থাকে কারণ তারা তাদের নীতি ও আদর্শ অনুসারেই কাজটা করে।

মনে রাখবেন মানসিক চাপ জীবনের একটা অংশ এটাকে আপনি চাইলেও এড়িয়ে যেতে পারবেন না। যখন আপনি আপনার মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবনযাপন করবেন, তখন আপনি একটি সদা প্রবাহিত নদীর স্রোতধারার মতো মানসিক শক্তি পাবেন। আগ্রহ ও সৃজনশীলতা আপনার ভেতর থেকে ঝরনার মতো প্রবাহিত হবে। আর মানসিক চাপ তখনই আসে যখন আপনি আপনার মূল্যবোধকে পাশ কাটিয়ে চলার চেষ্টা করেন।

আপনার মূল্যবোধকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখুন। আপনার অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ও বাসনাকে পরীক্ষা করুন। দেখুন এবং জিজ্ঞেস করুন যে এমন কী পরিবর্তন আনলে আপনার বাহ্যিক কাজকর্ম বদলে যাবে। যদি চাপ কমাতে চান তবে নিয়মমাফিক সৎ জীবনযাপন করুন।

আপনি একজন অসামান্য ও অনবদ্য ব্যক্তি। কারণ মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে বিবেক বোধ দিয়েছেন। মানুষ যখন নিজের পশুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে সৎভাবে দৈনন্দিন জীবনযাপন করে, তখনই সে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই তো পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

'আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদের উত্তম রিজিক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।'

(সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৭০)

এটা বোঝার চেষ্টা করুন কীভাবে আপনার মূল্যবোধ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। আর এটা আপনার সমগ্র জীবন ধরে বৃদ্ধি পায়। এটা আপনার অতিবাহিত জীবনের বহু ঘনটা, অভিজ্ঞতার আলোকে প্রভাবিত হয়।

আশপাশে এবং পরিবারগুলোতে প্রায়ই আমরা এমন কিছু লোকদের খুঁজে পাই যাদের সঙ্গ কখনোই আমাদের জীবনে সার্থক কিছু যোগ করতে পারে না। তবুও তাদের সাথে থাকা একটি অনিবার্য বাধ্যবাধকতা। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আমাদের তাদের সাথে পুরোপুরি পেশাদার থাকতে হবে এবং বেশিরভাগ সময়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

এবার নিজেকে বিশ্লেষণ করেছেন। নিজের অতীত নিয়ে কি কখনো ভেবেছেন? কারো সাথে প্রতারণা করলে তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন। যদি প্রশ্নের উত্তর 'না' আসে তবে আপনি টাইম ম্যানেজমেন্ট থেকে অনেক দূরে আছেন। আপনি জানেনই না জীবনের উদ্দেশ্য কী? কেন মহান আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন। কেন তিনি আপনার জীবনে প্রবাহমান প্রতিটি সময়ে হিসাব নেবেন। আসুন নিজেকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করি-

১. নিজেকে চেনা সবচেয়ে জরুরি? ধরুন কোনো অপরিচিত ব্যক্তি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি আসলে কে?'

-চট করে ভাবুন তো আপনি কী উত্তর দেবেন? লিখে ফেলুন :

২. আপনি কি আপনার পেশা, আপনার গুণাবলি আপনার আশা-ভরসা আপনার স্বপ্ন ও লক্ষ্য নিয়ে আলাপ করবেন?

- নাকি ভিন্ন কিছু বলবেন? লিখে ফেলুন :

৩. নিজের সম্পর্কে এক্ষুণি খাতায় ১০টা লাইন লিখুন। নিজেই দেখুন আপনি আপনার সম্পর্কে কী ভাবছেন?

আপনি যদি চান তবে আপনার আশপাশের লোকজনেরও মতামত নিতে পারেন। আপনি যাদের সাথে কাজ করেন বা আপনার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞেস করতে পারেন, 'আপনাকে তারা কেমনভাবে দেখে?' আপনার নীতি ও ব্যক্তিত্ব হিসেবে তারা আপনাকে কীভাবে বর্ণনা করে? তারা অন্যদের প্রতি আপনার আচার আচরণ দেখে আপনার সম্পর্কে কী বলতে চায়?

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি কি আত্মসম্মানের জীবনযাপন করতে চান? উত্তর যদি 'হ্যাঁ' আসে, তবে নিজেকে আপনার অতীতের শেকল থেকে মুক্ত করুন। নিজের সম্পর্কে উচ্চমত পোষণ করুন। এতে আপনার জীবনে নতুন আলো আসবে। আপনার প্রতিটি সময় হয়ে উঠবে আপনার জন্য আশীর্বাদ। একটি নতুন আলোকে নতুন জীবন শুরু করুন, অজুহাত দেয়া বন্ধ করুন।

৪. আপনার আশপাশের মানুষজন কেমন? আপনি তাদের সম্পর্কে কী চিন্তা করেন? মানবজাতিকে আপনি কীভাবে বর্ণনা করেন? মানুষ কি ভালো, ভদ্র ও ভালোবাসা যায় এমন? নাকি মানুষ অলস, কুটিল ও বিশ্বাসের অযোগ্য?

'ধরুন আপনি রাস্তায় গিয়ে একটা এক হাজার টাকার নেট বের করে বললেন, কেউ কি এটা নিতে চান? দেখবেন অনেক গরিব মানুষ আপনাকে ঘিরে ধরবে। এবার ইচ্ছে করে

টাকাটা ড্রেনে ফেলে দেন। তাতে ময়লা লেগে গেল। আপনি কোনোরকমে তা তুলে বললেন এটা কি তোমরা নেবে? সবাই তখনো হাত তুলবে।

এবার একটা শার্ট নিয়ে রাস্তায় নামুন, নতুন শার্ট। ঘোষণা দিন যে আপনি এটা দান করতে চান? কে কে নেবে। এবারো আপনাকে সবাই ঘিরে ধরবে। এবার শার্টটা পিঠের দিকে কাঁচি দিয়ে কেটে বলুন এবার কে কে নিতে চাও? কেউ নিতে চাইবে না। বরং গালমন্দ দিতে পারে। কিংবা অনেকেই আপনাকে পাগল বা বোকা ভাবতে পারে।

এখানে শেখার ব্যাপার হলো, এক হাজার টাকার নোট, যতই খারাপ অবস্থায় থাক-এটির মূল্য শুধু এক হাজার টাকার মতোই থাকবে। বন্ধুরা! ঠিক এর মতো, আপনি একাধিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে গেলেও আপনি নিজের মূল্য হারাতে পারবেন না যদি আপনি নিজের চোখে নিজের অবস্থাকে মূল্য দেন।

আর যদি নিজেকে শার্টের মতো কেটে ফেলেন তবে আপনার কোনো মূল্য নেই।

আপনার উত্তর থেকে বোঝা যাবে যে আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের সাথে কেমন ব্যবহার করেন? কীভাবে নিজেকে গড়ে তুলছেন। ভাবতে থাকুন। উত্তর আপনার পাশেই অপেক্ষা করছে। উত্তরটা লিখে ফেলুন-

৫. আপনার জীবনের মূল দর্শন কী? ভেবেছেন কি কখনো? যারা ইতিবাচক, স্বাস্থ্যবান ও সুখী লোকজন তারা জীবনকে একটি অপূর্ব ও স্নিগ্ধ অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখে। জীবনে সমস্যা-সম্ভাবনা থাকবেই কিন্তু পুরো ব্যাপারটা যেন এক মহান অভিযাত্রা।

মানুষ প্রার্থনা করে, আল্লাহ মীমাংসা করে। আমরা বিশ্বাস করি সেসব লোককে যাদের জীবন দর্শন আছে। যারা আপনার বিপদে এগিয়ে আসে। তাদের নিজস্ব সময়টাও আপনার জন্য ব্যয় করে। সময় ব্যয় করে আপনার জন্য ভাবে। আপনার কী করণীয় এ প্রসঙ্গে? আপনি কি আপনার জীবন দর্শন ভেবে বের করবেন না?

৬. আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য কী? বিষয়টা মনে মনে যেমন ভাববেন তেমনি কাগজে লিখে ফেলুন। খেয়াল করে দেখবেন যদি কোনো কারণে আমাদের লক্ষ্যগুলো পূরণ না হয় তাহলে আমরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাই।

মনে করুন আপনার কাছে একটি জাদুর লাঠি আছে। যা দিয়ে মাটিতে ঠুক করে আঘাত করে যা কিছু চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়। তবে শর্ত হচ্ছে কেবল একটি ইচ্ছাই পূরণ হবে।

কী চাইবেন তা লিখে ফেলুন ১০ সেকেন্ডের মধ্যে?

....

....

....

....

....

....

এবার যা লিখেছেন তা নিয়ে ভাবুন। প্রথম ১০ সেকেন্ড কি সঠিক লক্ষ্যটা লিখেছেন? যদি লিখে থাকেন তাহলে ঠিক পথেই আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে। এবার মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন।

এই ছোট ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিজেকে জিজ্ঞেস করা অতি জরুরি। যখন আপনি আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব স্পষ্টভাবে পেয়ে যাবেন যা ততটা সহজ নয়, তখন আপনি নিজের জীবনের প্রাধান্যের বিষয়গুলো সহজেই সাজাতে পারবেন এবং আপনার সময়কে গুছিয়ে নিতে পারবেন। দেখবেন আপনার জীবনের প্রাধান্য ও সময় একই দিকে চলছে।

(নেপোলিয়ন হিল তার বিশ বছরের গবেষণায় আবিষ্কার করেছেন যে যখন একজন ব্যক্তির সামনে তার জীবনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, লিখিত ও স্পষ্টভাবে তার সামনে থাকে সে তার জীবনকে সাধারণ জায়গা থেকে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যায়)

আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলো কী? লক্ষ্যকে পূর্ণ করতে এরকম লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করুন-

- যে অন্যকে প্রতারণা করে এবং আপনার প্রতি আনুগত্যের দাবি করে।
- যারা তাদের পেছনে পেছনে থাকা লোকদের নিয়ে গুজব ছড়ায় এবং কথা বলে।
- যারা সামাজিক না বা যাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নেই।
- যারা তাদের পিতামাতাকে সম্মান করে না।
- যাদের জীবনে নেতিবাচক এবং হতাশাজনক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং যেকোনো কাজের আগে ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি করেন।
- যারা আপনাকে তাদের অপকর্মের ঘূর্ণিতে টেনে আনতে চায়।
- যে কখনো আপনার ভুল কাজের বিরোধিতা করে না।
- যারা অর্থের ভাষা বোঝে, মানুষের সম্পর্ক নয়।

এগুলো এমন লোক যাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরে যেতে হবে। আপনি যদি সাধু হন তবেই আপনি তাদের রূপান্তরিত করতে পারবেন আশাবাদী হিসেবে, আপনি যদি সামাজিক হন তবে এগুলো থেকে দূরে থেকে আরো ভালো করতে পারেন।

৮

সামাজিক যোগাযোগে টাইম ম্যানেজমেন্টে

'জীবন হোক কর্মময়, নিরন্তর ছুটে চলা। চিরকাল বিশ্রাম নেয়ার জন্য তো কবর পড়েই আছে।'

-হযরত আলী (রা)

নিখুঁত কাজের বাহানায় গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করে ফেলে অনেকেই। এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। অনেক মানুষের স্বভাবগত দোষ হলো কোনো কিছুতে 'না' বলতে পারেন না। দিন শেষে দেখা যায়, প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় কাজের চাপে কোনো কাজ করা হলো না।

জরুরি নয় এমন কাজ দিনের শুরুতেই করে মানসিক ও শারীরিক সতেজতা হারিয়ে যায়। পরে দেখা যায় জরুরি কাজই করা হয়নি।

আমরা অনেকেই গান শুনতে শুনতে বই পড়ি, অঙ্ক কষি কিংবা ছবি আঁকি। টিভি দেখতে দেখতে খাওয়া এখনকার প্রজন্মের জন্য খুবই সাধারণ একটা বিষয়। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ইমু আরো নানা হাবিজাবি সব কাজের নিত্যসঙ্গী। অথচ এ কাজগুলো আমাদের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করে বহুগুণে। গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী মাল্টিটাস্কিং মস্তিষ্কে দক্ষতা কমিয়ে দেয় অনেকখানি। তাই মাল্টিটাস্কিং পরিহার করতে হবে। এছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিডিও গেম খেলা, অতিমাত্রায় অভিযোগ করা, অধিক নেতিবাচক ধারণা, নিরর্থক চাহিদা, ভুল মানুষের সাথে সময় ব্যয় করা ইত্যাদি পরিহার করা।

ফেসবুক অনেকটা সকালবেলার ঘুমের মতো। আর পাঁচটা মিনিট ঘুমিয়ে নিই বলে দুই চোখের পাতা এক করলেই কীভাবে যেন দুই ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। আর ফেসবুকে একবার ঢুঁ মেরে নোটিফিকেশনগুলো দেখি বললে ঘণ্টা পেরোনোর আগে দেখা আর শেষ হয় না। তবে ঘণ্টা পেরোনোর ব্যাপারটা যদি কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তবে হয়তো ফেসবুকে অযথা সময় ব্যয় কমতে পারে। আর সে কাজের ভার খোদ ফেসবুকই নিয়েছে। ফেসবুকে একজন ব্যবহারকারী দিনে কত সময় কাটাচ্ছেন, তা ফেসবুকেই দেখে নেয়ার সুবিধা আছে।

সুবিধাটির নাম 'ইয়োর টাইম অন ফেসবুক'। আর ফেসবুকের মালিকানাধীন ইনস্টাগ্রামে সেটি 'ইয়োর টাইম' হিসেবে পরিচিত।

সেখানে আপনি যদি 'সেট ডেইলি রিমাইন্ডার' সচল করে দেন, তবে ফেসবুক ব্যবহারের সময়সীমা ছাড়িয়ে গেলে আপনাকে জানিয়ে দেবে। আবার চাইলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেসবুকের নোটিফিকেশন বন্ধ করেও দিতে পারেন। একবার হলেও বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখুন। দেখবেন কতটা সময় আপনি অযথা নষ্ট করেছেন।

গোটা বিশ্ব থেকে ৪০ কোটির বেশি লোক ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলেছে (এটা ২০২১ সালের ডিসেম্বরের পরিসংখ্যান)। এক বছর বা দুই বছর পর এটা দ্বিগুণ হতে পারে। বর্তমানে যারা ফেসবুক ব্যবহার করছেন, এদের মধ্যে কমপক্ষে ২০ কোটি প্রতিদিন ফেসবুকে ঢোকে। একজন অ্যাকাউন্টধারীর গড়পড়তা ১৭০ জন করে 'বন্ধু' আছে। প্রত্যেক মাসে ফেসবুকের সব ব্যবহারকারী মিলে এর পেছনে ৫০ হাজার কোটি মিনিট সময় ব্যয় করে। বহুল আলোচিত

সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট ফেসবুক এই কথাগুলো নিজেই সদর্পে লিখে রেখেছে তার পরিসংখ্যান পাতায়।

ফেসবুকের নিজের দাবি (২০২১ সালের ডিসেম্বরে), ব্যবহারকারীরা এক মাসে তার পেছনে ৫০ হাজার কোটি মিনিট ব্যয় করে। এ বিপুল সময়কে ঘণ্টা, দিন, বছর এভাবে হিসাব করলে আসে ৯ লাখ ৫১ হাজার ২৯৩ বছর। অর্থাৎ বিপুল জনগোষ্ঠীর এক মাসের মোট সময় থেকে সাড়ে ৯ লাখ বছর নিজের পেছনে খরচ করাতে পারা ফেসবুকের কাছে দারুণ গর্বের বিষয়। ফেসবুকের নিজের এই গর্বের পেছনে যুক্তি আছে। কিন্তু যারা সেই সময়টা ফেসবুককে 'উৎসর্গ' করছে তারা কী পাচ্ছেন সেটা জানার জন্য ফেসবুক কী সে সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা দরকার।

গত ২৯ মে ২০২১ বাংলাদেশ সরকার ফেসবুক সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়। এতে গোটা দেশে বিশেষ করে গণমাধ্যমে 'গেল গেল' রব পড়ে গিয়েছিল। চায়ের কাপে ঝড় দেখে স্বাভাবিকভাবেই যারা ফেসবুকের সাথে পরিচিত নন, তারা ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'কী না জানি কী জিনিস থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন'। যারা ফেসবুক নিয়ে সময় কাটান না তাদের জানা উচিত তারা জিতছেন নাকি ঠকছেন। আর মা-বাবাদের জানা উচিত তাদের সন্তানরা ফেসবুকে বুঁদ হয়ে আসলেই কতটা 'সামাজিক' হয়ে বেড়ে উঠছে। এতে তাদের ছাত্রজীবন কিংবা ক্যারিয়ার জীবন কতটুকু লাভবান হচ্ছে।

ফেনবুককে বলা হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। এ কথা সত্য তা সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। কবে এর নেচিবাচক দিকটা এখন রীতিমতো দুশ্চিন্তার বিষয়।

তরুণ প্রজন্ম ফেসবুকের মাধ্যমে কী ধরনের সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করছে সেটা পর্যবেক্ষণের জন্য গত ২১ ডিসেম্বর দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ৩০ জন বাংলাদেশি তরুণের প্রোফাইল বেছে নিয়ে তা ফলো করা হয়। এদের ৫ জন স্কুলছাত্র এবং ৫ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, ৫ জন গৃহিণী, ৫ জন চাকরিজীবী, ৫ জন পেশাজীবী এবং বাকি ৫ জন বয়স্ক। কমেন্ট লেখার সময় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত ১১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের পেছনে সময় ব্যয় করেছে! বিশেষ করে তরুণসমাজ। তাদের 'অ্যাকটিভিটি' লিস্ট থেকে দেখা যায় সবাই এই সময়টুকু বিভিন্ন মেয়ের প্রোফাইলে মন্তব্য লিখে সময় কাটিয়েছে।

একজন স্কুলছাত্র এক রাতে সর্বোচ্চ ৬৩ জন মেয়ের প্রোফাইলের ওয়ালে কিংবা স্ট্যাটাসে মন্তব্য লিখেছে! মজার ব্যাপার হলো, মন্তব্যগুলো পড়লেই বোঝা যায়, এদের মধ্যে কেউই তাদের পরিচিত নয়। মোটামুটি মন্তব্যগুলোর ধরন এরকম, 'আমি তোমার বন্ধু হতে চাই', 'তুমি কোথায় থাকো?' 'তোমার ফোন নম্বর দেবে কি?' 'তুমি এত সুন্দরী', 'বৃষ্টিতে ভিজলে তোমাকে দারুণ লাগবে', 'তুমি ক্রাশ খাওয়ার মতো' ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় সব কথা। এসব কমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো অশ্লীল মন্তব্য কিংবা অশ্লীল ছবির আদান প্রদান। এমনকি সেসব অশ্লীল ছবি একজন স্কুলছাত্রের জন্য কতটা নেতিবাচক তা ভাবনার অতীত। বেশিরভাগ মেয়ের আপলোড করা ছবিতে ছেলেরা হয় সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছে কিংবা অশ্লীল মন্তব্য লিখে রেখেছে। এভাবে দিনের কিংবা রাতের মূল্যবান সময় খরচ করে 'সামাজিক যোগাযোগ' রক্ষা করছে তরুণ প্রজন্ম!

যে ব্যক্তি মানুষের কাছে এমন বিষয় নিয়ে গর্ব-অহংকার করে বেড়ায়; প্রকৃতপক্ষে যা তার কাছে নেই। অযথা কটু কথা বলা তরুণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিনা প্রয়োজনে অশ্লীল কথা বলাই যেন স্মার্টনেস। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

'কঠোর প্রকৃতি ও কটুভাষী লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং ওই লোকও নয়, যে এমন সব বিষয়ে মানুষের কাছে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করে বেড়ায় প্রকৃতপক্ষে যা তার কাছে নেই।'

(আবু দাউদ)

অন্য হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

'কেয়ামতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণির লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের গোনাহ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো- বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক এবং অহংকারী গরিব।'

(মুসলিম)

অথচ ইসলামের আলোকে একজন স্কুলছাত্র অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত? এই প্রশ্ন আমরা কখনো আমরা আমাদের কি করেছি? কীভাবে আপনার সন্তান বেড়ে উঠছে? কার সময় সে কীভাবে অপচয় করছে? ভাবতে পারেন নতুন করে। নিচের ঘটনাটি হতে পারে আপনার সন্তানের সঠিক সময় ব্যবহার করে চরিত্র গঠনের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন কমবয়সী সাহাবা, নাম থা'লাবা (এ্তযধথষধনধ, বাংলায় অনেক সময় সা'লাবা বলা হয়)। মাত্র ষোলো বছর বয়স। রাসুল (সা.)-এর জন্য বার্তাবাহক হিসেবে এখানে সেখানে ছোটাছুটি করে বেড়াতেন তিনি। এক দিন উনি মদিনার পথ ধরে চলছেন, এমন সময় একটা বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তার চোখ পড়ল দরজা খুলে থাকা এক ঘরের মধ্যে। ভেতরে গোসলখানায় একজন মহিলা গোসলরত ছিলেন এবং বাতাসে সেখানের পর্দা উড়ছিল, তাই থা'লাবার চোখ ওই মহিলার ওপর গিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে উনি দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। যদিও পুরো ঘটনাটা ছিল আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু থা'লাবার মন এক গভীর অপরাধবোধে ভরে গেল। প্রচণ্ড দুঃখ তাকে আচ্ছাদন করল। তার নিজেকে মুনাফিকের মতো লাগছিল। তিনি ভাবলেন, 'কীভাবে আমি রাসুল (সা.)-এর সাহাবা হয়ে এতটা অপ্রীতিকর কাজ করতে পারি? মানুষের গোপনীয়তাকে নষ্ট করতে পারি? যেই আমি কি না রাসুল (সা.)-এর বার্তা বাহক হিসেবে কাজ করি, কেমন করে এই ভীষণ আপত্তিজনক আচরণ তার পক্ষে সম্ভব?' তার মন আল্লাহর ভয়ে কাতর হয়ে গেল।

তিনি ভাবলেন, 'না জানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমার এমন আচরণের কথা রাসুল (সা.)-এর কাছে প্রকাশ করে দেয়!' ভয়ে, রাসুল (সা.)-এর মুখোমুখি হওয়ার লজ্জায়, তিনি তৎক্ষণাৎ ওই স্থান থেকে পালিয়ে গেলেন।

এভাবে অনেক দিন চলে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু ওয়ালাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সাহাবাকে থা'লাবার কথা জিজ্ঞেস করতেই থাকতেন। কিন্তু সবাই জানাল কেউ-ই

থা'লাবাকে দেখেনি। এদিকে রাসুল (সা.)-এর দুশ্চিন্তা ক্রমেই বাড়ছিল। তিনি উমর (রা.), সালমান আল ফারসিসহ আরো কিছু সাহাবাদের পাঠালেন থা'লাবার খোঁজ আনার জন্য। মদিনা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও থা'লাবার দেখা মিলল না। পরে মদিনার একেবারে সীমানাবর্তী একটা স্থানে, মক্কা ও মদিনার মধ্যখানে অবস্থিত পর্বতময় একটা জায়গায় পৌঁছে কিছু বেদুইনের সাথে দেখা হলো তাদের। সেখানে এসে তারা থা'লাবার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। তা বললেন, 'তোমরা কি লম্বা, তরুণ, কমবয়সী একটা ছেলেকে এদিকে আসতে দেখেছ?'

বেদুইনগুলো মেষ চড়াচ্ছিল। তারা জবাব দিল, সে খবর তারা জানে না, তবে তারা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি ক্রন্দনরত বালকের সন্ধানে এসেছ?'

এ কথা শুনে সাহাবিরা আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং তার বর্ণনা জানতে চাইলেন।

উত্তরে বেদুইনরা বলল, 'আমরা প্রতিদিন দেখি মাগরিবের সময় এখানে একটা ছেলে আসে, সে দেখতে এত লম্বা, কিন্তু খুব দুর্বল, সে শুধুই কাঁদতে থাকে। আমরা তাকে খাওয়ার জন্য এক বাটি দুধ দিই, সে দুধের বাটিতে চুমুক দেয়ার সময় তার চোখের পানি টপটপ করে পড়ে মিশে যায় দুধের সাথে, কিন্তু সেদিকে তার হুঁশ থাকে না!'

তারা জানাল চল্লিশ দিন যাবৎ ছেলেটা এখানে আছে। একটা পর্বতের গুহার মধ্যে সে থাকে, দিনে একবারই সে নেমে আসে, কাঁদতে কাঁদতে; আবার কাঁদতে কাঁদতে, আল্লাহর কাছে সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে ওপরে চলে যায়।

সাহাবারা বর্ণনা শুনেই বুঝলেন, এ থা'লাবাই হবে।

তবে তারা ওপরে গিয়ে থা'লাবাকে ভড়কে দিতে চাচ্ছিলেন না, এজন্য নিচেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। যথাসময়ে প্রতিদিনের মতো থা'লাবা ক্রন্দনরত অবস্থায় নেমে আসলেন, তার আর কোনোদিকে খেয়াল নেই। কী দুর্বল শরীর হয়ে গেছে তার! বেদুইনদের কথামতো তারাও দেখতে পেলেন, থা'লাবা দুধের বাটিতে হাতে কাঁদছে আর তার অশ্রু মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তার চেহারায় গভীর বিষাদের চিহ্ন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। সাহাবারা তাকে বললেন, 'আমাদের সাথে ফিরে চলো'; অথচ থা'লাবা যেতে রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি বারবার সাহাবাদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন,

'আল্লাহ কি আমার মুনাফেকিবিষয়ক কোনো সুরা নাজিল করেছে?'

সাহাবারা উত্তরে বললেন, আয়াত নাজিল হয়নি।

উমর (রা.) বললেন, রাসুল (সা.) আমাদের তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। তুমি যদি এখন যেতে রাজি না হও, তাহলে তোমাকে আমরা জোর করে ধরে নিয়ে যাব। রাসুল (সা.)-এর কথা অমান্য করবেন এমন কোনো সাহাবা ছিল না। কিন্তু থা'লাবা এতটাই লজ্জিত ছিলেন যে, ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন না। এরপর সাহাবারা তাকে রাসুল (সা.)-এর কাছে মদিনায় নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে থা'লাবা আবারো একই প্রশ্ন করেন, 'আল্লাহ কি আমাকে মুনাফিকদের মধ্যে অন্তর্গত করেছেন অথবা এমন কোনো আয়াত নাজিল করেছেন? যেখানে বলা আমি মুনাফিক?'

রাসুল (সা.) তাকে নিশ্চিত করলেন যে এমন কিছুই নাজিল হয়নি। তিনি থা'লাবার দুর্বল পরিশ্রান্ত মাথাটা নিজের কোলের ওপর রাখলেন।

থা'লাবা কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এমন গুনাহগার ব্যক্তির মাথা আপনার কোল থেকে সরিয়ে দিন।'
তার কাছে মনে হচ্ছিল যেন সে এসব স্নেহের যোগ্য না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিতেই থাকলেন। আল্লাহর রহমত আর দয়ার ওপর ভরসা করতে বললেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন। এমন সময় থা'লাবা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল আমার এমন মনে হচ্ছে যেন আমার হাড় আর মাংসের মাঝখানে পিঁপড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে।'
রাসুল (সা.) বললেন, 'ওটা হলো মৃত্যুর ফেরেশতা। তোমার সময় এসেছে থা'লাবা, কালিমা শাহাদাত পড়ো।'
থা'লাবা কালিমা শাহাদাত বলতে থাকলেন, 'আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ নেই, মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।'
উনি কালিমা শাহাদাত বলতে থাকলেন... বলতেই থাকলেন... এমনভাবে তার রুহ শরীর থেকে বের হয়ে গেল।
মহানবী (সা.) থা'লাবাকে গোসল করিয়ে জানাজার পর কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আরো অনেক সাহাবা থা'লাবাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন।
মহানবী (সা.) পা টিপে টিপে অনেক সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। উমর রাদিয়ালাহু আনহু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া আল্লাহর রাসুল, আপনি এভাবে কেন হাঁটছেন যেন ভিড়ের মাঝে হেঁটে চলেছেন... কত রাস্তা ফাঁকা পড়ে আছে, আপনি আরাম করে কেন চলছেন না ইয়া রাসুল?'
উত্তরে রাসুল (সা.) বললেন, 'হে উমর, আমাকে অনেক সাবধানে চলতে হচ্ছে। সমস্ত রাস্তা ফেরেশতাদের দ্বারা ভরে গেছে। থা'লাবার জন্য এত ফেরেশতা এসেছে যে আমি ঠিকমতো হাঁটার জায়গা পাচ্ছি না।'
সুবহান আল্লাহ!

এই সেই থা'লাবা যে ভুলক্রমে একটা ভুল করার জন্য এত প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। গুনাহর কাজ করা তো দূরের কথা, গুনাহ না করেও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে চেয়ে ব্যাকুল হয়েছেন। কত উঁচু ছিলেন তিনি আল্লাহর চোখে যে তাকে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের আগমনে রাস্তা ভরে গিয়েছিল! এসব ফেরেশতা নেমে এসেছে শুধু থা'লাবার জন্য, তার জন্য দোয়া করার জন্য, তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর আমরা সারাদিন জেনে না জেনে এত ভুল করেও, এত গুনাহ করেও অনুশোচনা করি না! উল্টো আমাদের পছন্দমতো কিছু না হলেই আল্লাহর আদেশের ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকি, জীবন নিয়ে নালিশ করতে থাকি। একটা হাদিস আছে-

'মু'মিন বান্দার কাছে তার গুনাহগুলো এমন যেন এখনই পাহাড় ভেঙে তার মাথার ওপর পড়বে; আর একজন দুর্বৃত্তকারীর কাছে গুনাহ এরকম যে মাছি এসে তার নাকের ওপর ওড়াউড়ি করছে, আর সে হাত নাড়িয়ে সেটা সরিয়ে দিল।'

(বুখারি, বই : ৭৫, হাদিস নং ৩২০)

আমরা আমাদের গুনাহগুলোকে দেখেও না দেখার ভান করি। স্বীকার করতে চাই না। কতরকম যুক্তি দিয়ে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করি। একটু ফ্যাশন, শখ, মনের ইচ্ছা পূরণ, মানুষের সামনে বড় হওয়া, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমরা গুনাহও কাজে জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে ক্ষমা চাওয়ার কথা ভাবতে পারি না। আমাদের যুক্তি, অহংকার, শয়তানের মতোই আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বিরত রাখে।

কিয়ামতের দিন এক আল্লাহর রহমত আর দয়া ছাড়া কিছুই আমাদের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না। জান্নাত তাদের জন্যই যারা আল্লাহর কাছে মাথানত করে। আত্মসমর্পণ করে পূর্ণভাবে। নিজের ইচ্ছা, অহম বোধের কাছে মাথানত করে না। তাই ইমানদার ব্যক্তিই বিনয়ী। তার রবের সামনে কাঁদতে সে লজ্জা পায় না। ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সততার সাথে ক্ষমা চেয়ে দৃঢ়ভাবে সেই কাজ থেকে বিরত থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

'যে তওবা করে এবং ইমান আনে ও পুণ্য-পবিত্র ক্রিয়াকর্ম করে। সুতরাং তারাই, আল্লাহ তাদের মন্দ কাজকে সৎকাজ দিয়ে বদলে দেবেন। আর আল্লাহ সতত পরিত্রাণকারী, অফুরন্ত ফলদাতা।'

(সুরা ফুরকান, ৭০)

আল্লাহ আমাদের জেনে না জেনে করা গুনাহগুলো থেকে ক্ষমা করে দিক! আমাদের সঠিকভাবে মনের অন্তঃস্তল থেকে অনুতাপ করার, ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দান করুক। আমাদের নিজেদের ভুল বোঝার আর স্বীকার করে নিয়ে খারাপ কাজগুলো থেকে দূরে থাকার তওফিক দিক।

তরুণদের চরিত্র তৈরি হতে হবে আল্লাহর প্রিয় বান্দা থা'লাবা (রা.)-এর মতো। কিন্তু জীবন গড়ার সময়ে আমাদের কিশোর প্রজন্ম কীভাবে বেড়ে উঠছে তা ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। কিশোর-কিশোরীরা বেড়ে উঠছে 'আমি তোমার বন্ধু হতে চাই', 'তুমি কোথায় থাকো?' 'তোমার ফোন নম্বর দেবে কি?' 'তুমি এত সুন্দরী', 'বৃষ্টিতে ভিজলে তোমাকে দারুণ লাগবে', 'তুমি ক্রাশ খাওয়ার মতো' ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় সব কথার মধ্য দিয়ে। আবার অনেকে শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অশ্লীল কাজ আর ব্যভিচার যেন স্মার্ট হয়ে ওঠার নতুন হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। তার চর্চা এখন রাতদিন। ফোনবুকের পোস্টে-পোস্টে, কমেন্টে-কমেন্টে, মেসেঞ্জারে কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ-ইমোর ভিডিও কনফারেন্সে।

টাইম ম্যানেজমেন্ট হতে হবে জীবনের জন্য। জীবনের সফলতার জন্য। জীবন ধ্বংসের জন্য নয়। ভুল টাইম ম্যানেজমেন্টের কারণে অশ্লীলতা বাড়ছে। সাথে হু হু করে বাড়ছে ব্যভিচার।

ফেসবুক বিলাস

বাংলাদেশে বর্তমানে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ কোটি ২০ লাখ (ডিসেম্বর ২০২১, বিটিআরসির তথ্যমতে) এবং সর্বোচ্চ ফেসবুক ব্যবহারকারীর দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। এদের মধ্যে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মোট ব্যবহারকারীর শতকরা ৫৮ ভাগ এই বয়সের, যে বয়সটার মূল ব্রত হওয়া উচিত শিক্ষালাভ কিংবা ক্যারিয়ার গঠনে মনোনিবেশ। প্রতিটি ঘণ্টাই যাদের জন্য অসীম গুরুত্বপূর্ণ তারা রাত

জেগে এই 'সামাজিক যোগাযোগ' রক্ষা করে চলেছে! বাংলাদেশিদের মধ্যে যারা পড়াশোনা শেষ করে চাকরি জীবনে প্রবেশ করেছেন বলে ধরে নেয়া যায় (২৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সী) তাদের মধ্যে ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট খুলেছেন ৩১%। অপচয় করার মতো সময় যে বয়সী লোকদের থাকার কথা, বিশেষ করে পুরনো বন্ধুবান্ধব কিংবা আত্মীয়-পরিজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার কথা যাদের, ফেসবুকের প্রতি তাদের আগ্রহ তুলনামূলক কম। ফেসবুকে সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট করছে কিশোর ও তরুণ সমাজ।

সরাসরি কারো সঙ্গে দেখা হয় না বলে ফেসবুক মিথ্যা আর ছলনা চর্চার উৎকৃষ্ট এক স্থান। যে যা নয়, তাই সাজার চেষ্টা করে অগণিত ব্যবহারকারী। পুরুষরা নারীর পরিচয়ে অ্যাকাউন্ট খোলে। আবার অনেক পুরুষ নিজেদের অনেক জ্ঞানী, ধনী কিংবা বিদ্যান পরিচয় দিয়ে নারীদের মন জয় করার চেষ্টা করে।

মিথ্যা কথা বলে নিজের ওয়েবসাইটে ভিজিটর টানার চেষ্টা চলে। কিংবা সুন্দরী তরুণী সেজে ব্যর্থ কিংবা হিংসুটে প্রেমিক তার প্রেমিকার মোবাইল নাম্বার ফেসবুকে হাজার হাজার ব্যবহারকারীর মধ্য ছেড়ে দেয়। কিংবা তরুণীদের ছবি কপি করে ফটোশপের সাহায্যে পর্নো তারকাদের শরীরে জুড়ে দিয়ে 'গোপন ক্যামেরায় ধারণ করা' বলে মেয়েটিকে সামাজিকভাবে হেয় করার চেষ্টা চালায়। এতে আত্মহত্যার প্রবণতাও বাড়ছে। বাড়ছে হতাশা, বিপথগামীর সংখ্যাও।

বাসা কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসে অনেক ছাত্রছাত্রী কিংবা অফিসে বসে অনেক কর্মচারী ফেসবুকে সময় ব্যয় করাকে 'সামাজিক যোগাযোগ' বলে মনে করে। তবে আসলেই কি তা 'সামাজিক যোগাযোগ'?

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালিসহ উন্নত দেশগুলোর অধিকাংশ নামকরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেসবুক ব্লক করা। এছাড়া বিখ্যাত আইটি ফার্ম রবার্ট হাফ টেকনোলজির পরিচালিত গবেষণা জরিপ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ করপোরেট অফিসে ফেসবুক নিষিদ্ধ। এই হার ব্রিটেনে প্রায় ৭০ শতাংশ এবং অস্ট্রেলিয়াতে প্রায় ৫৫ শতাংশ। ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, জার্মানি, জাপানসহ বহু দেশের অগণিত প্রতিষ্ঠানে ফেসবুক বন্ধ করে রাখা হয়। অনেক অফিসে ফেসবুক ব্যবহার 'ছাঁটাইযোগ্য অপরাধ' হিসেবে নিয়োগপত্রে শর্ত দিয়ে থাকে। ব্রিটেনে স্মার্ট আইটি পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ৫৭ শতাংশ অফিস কর্মচারী স্বীকার করেছেন, বাসায় পরিবারের লোকজনকে সময় দিতে হয়, তাই ফেসবুকে ব্যয় করার সময় তারা বের করেন অফিসে গিয়ে! ভারতেও বহু শিক্ষা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ফেসবুক বন্ধ করে রেখেছে।

ইসলামিক আলোচনায় ফেসবুক, ইমো, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি কি তাহলে ব্যবহার করা যাবে না? যদি মনে করে থাকে 'যাবে না' তাহলে এখনো ভুলের মধ্যে আছেন। আপনি অবশ্যই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে তা হতে হবে অশ্লীলতামুক্ত। এবং তা ব্যবহার করবেন নির্ধারিত সময়ে বা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সময়। অনেকেই আধুনিকতার সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেলেন। মনে রাখবেন ইসলামই সবচেয়ে বেশি আধুনিক। যদি আপনি তার সঠিক ব্যবহার জানেন।

মনে রাখবেন মাইক ব্যবহার ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। তবে মাইকে অশ্লীল গান কিংবা জনগণের ক্ষতি হয় এমন ভলিউমে তা বাজানোর ক্ষেত্রে ইসলামের নিষেধ রয়েছে। মোদ্দা কথা হলো

আপনি যদি পরিপূর্ণ আধুনিক মুসলিম হতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে। বর্তমানে আমরা উড়ো সংবাদ শুনে, অমুকে এটা বলেছেন, হাদিসে আছে ইত্যাদি ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে নানান মন্তব্য করে ফেলি। অনেকে ইসলামি ফতোয়াও দিয়ে ফেলি মুহূর্তে। মনে রাখবেন আপনার ভুল ব্যাখ্যার কারণে যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তার দায়ভার আপনাকেই নিতে হবে।

বলা হয়ে থাকে জ্ঞানের স্তর তিনটি :

১. যে প্রথম স্তরে প্রবেশ করবে সে অহংকারী হয়ে উঠবে যেন সে সবকিছুই জানে।

২. দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করার পর সে বিনয়ী হয়ে উঠবে।

৩. তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করার পর সে নিজের অজ্ঞতা বুঝতে পারবে।

নিজেকে মূল্যায়ন করতে নিজ্জের জ্ঞান সম্পর্র্কে নিশ্চিত হোন। এতে আপনার কর্মপরিকল্পনায় সুবিধা হবে। আপনি শুনুন বেশি, বলুন কম। দেখবেন আপনার সময় সবচেয়ে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে পারবেন।

জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি হলো সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। সময় একটি বড় নিয়ামত আর এই নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেকের উচিত।

'জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্ত্বর।'

সৈয়দ মুজতবা আলী

৯
আগামীর পরিকল্পনা

'নিজেকে বদলাও, ভাগ্য নিজেই বদলে যাবে।'
-বিখ্যাত পর্তুগিজ প্রবাদ

সময়-ব্যবস্থাপনা আসলে সময়কে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো বিষয় নয়। কেননা ব্যবহারিক অর্থে, যার ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ নেই, আপনি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না!

সময়-ব্যবস্থাপনা হচ্ছে নিজেকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে, আমরা যে সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ সেই সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এমনটি আসলে কীভাবে করা যায়?

সহজ উত্তর হলো আপনার জীবনের পরিপূর্ণ একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে। আমরা স্বাভাবিকভাবেই দ্রুত চিন্তা ও কাজ করে থাকি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের সামাজিক জীবনের জন্য দ্রুত চিন্তা উপযুক্ত। কিন্তু সঠিক টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য ধীরচিন্তা জরুরি।

'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। অচিরেই আমি তোমাদের দেখাব আমার নিদর্শনাবলি। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না।'
(সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ৩৭)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে-

'মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তো অতি ত্বরাপ্রবণ।'
সুরা আল-ইসরা (বনি ইসরাইল), আয়াত ১১

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই কিছুটা সময় নিয়ে চিন্তা করে। আপনি কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন? প্রশ্নটা নিয়ে একটু থেমে, ধীরেসুস্থে চিন্তা করুন। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আপনার হাতে থাকা তথ্যগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করুন। ভুলেও তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না।

জীবনের জন্য দরকার অবসর, দুশ্চিন্তামুক্ত সময়। যা কেবল আপনার ধার বুদ্ধিসম্পন্ন সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। কারণ ইসলাম আপনাকে ধীর হওয়ার পরামর্শ দেয়।

মানুষ কীভাবে অকল্যাণ কামনা করে তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মানুষ যখন নিজের কোনো কাজের ওপর রাগ হয় বা সন্তান-সন্ততির ওপর বিরক্ত হয় তখন তাদের জন্য বদদোয়া করতে থাকে। বলতে থাকে, তোর ধ্বংস হোক, পরিবার নাশ হোক ইত্যাদি। এ জাতীয় দোয়া করলেও তার মন কিন্তু সে দোয়া কবুল হওয়া চায় না। আবার যখন নিজে খুব ভালো অবস্থায় থাকে বা সন্তান-সন্ততির ওপর খুশি হয়ে যায় তখন বড় বড় নেক দোয়া করতে থাকে। সে তখন এটা কবুল হওয়া মনপ্রাণ থেকেই চায়।

কিন্তু আল্লাহ তার রহমতের কারণে মানুষের নেক দোয়া সমূহকে কবুল করে থাকেন আর বদদোয়ার জন্য সময় দেন। মানুষের এ তাড়াহুড়াকারী চরিত্রের কারণে যদি তিনি তাদের শাস্তি দিতেন তবে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতো। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে

তার নিজের ও সন্তান-সন্ততির ওপর বদদোয়া করতে নিষেধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

'তোমরা তোমাদের নিজের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও তোমাদের কর্মচারীদের ওপর বদদোয়া করো না। অনুরূপভাবে তোমাদের সম্পদ নাশের জন্যও বদদোয়া করো না। কারণ এমন হতে পারে যে, আল্লাহর দোয়া কবুলের সময় তোমাদের এ বদদোয়াগুলো সংঘটিত হয়ে যাবে আর তা কবুল হয়ে যাবে।'

(আবু দাউদ : ১৫৩২)

অন্য এক হাদিসে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

'তোমাদের কেউ কষ্ট ও যাতনায় পড়ে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আর যদি তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তবে সে যেন বলে-ইয়া আল্লাহ! যতদিন বেঁচে থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখেন এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য উত্তম হয়, তখন আমার মৃত্যু দেন।'

(বুখারি : ৬৩৫১)

আপনি যদি টাইম ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে চান আর আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিতে আগ্রহী হন তবে আপনাকে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে হবে। আপনাকে 'ধীর চিন্তা' চর্চা করতে হবে। আপনি চেষ্টা করতে থাকুন এবং তা মন থেকে বিশ্বাস করুন।

'মানবজীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে তার 'মন এবং জবানকে' নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সমর্থ হওয়া।'

ইমাম গাজ্জালী, সুফি, দার্শনিক

আগে গভীরভাবে চিন্তা করুন তারপর শুরু করুন

প্রায়ই দেখা যায় আপনি নিজেকে কোনো কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে বা ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আবিষ্কার করলেন। আপনি অনেক কাজ করছেন, ব্যস্ত সময় পার করছেন। কিন্তু কী অর্জন করতে চান, তা কি স্মরণ আছে? এজন্যই কাজ করার আগে চিন্তা করতে হয়।

ঈশপের 'রাখাল সাজা নেকড়ে' গল্পটা মনে আছে তো?

ধরা খাওয়ার ভয়ে এক নেকড়ে কিছুতেই ভেড়ার পালের কাছ ঘেঁষতে পারছিল না। তখন জামা-কাপড় পরে সে রাখাল সেজে নিল। এইবার সে সোজা চলে গেল ভেড়াগুলোর পাশে। আসল রাখাল তখন গাছের নিচে গভীর ঘুমে আর ভেড়াগুলো নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে। মুশকিলটা হলো ভেড়া পাকড়াও করতে অন্তত কোনো একটাকে দলছুট করা দরকার! নেকড়ে-রাখাল তাই আসল রাখালের মতো হুস-হাস আওয়াজ করে ভেড়াগুলোকে এদিক-ওদিক ভাগানোর তাল করল। তাতে লাভ তেমন হলো না। বরং ভুলে গলা দিয়ে নেকড়ের ডাক বেরিয়ে এলো। ব্যস, রাখাল গেল জেগে। পিটুনির চোটে নেকড়ে শেষ।

নীতিশিক্ষা : *ছদ্মবেশ ধরে কাজ করতে গেলে পরিণাম ভালো হয় না।*

আপনি যে কাজই করুন না কেন তার পরিণাম কী হবে তা মাথায় রাখুন। আপনি কী চান তা বাদ দিন। আপনার আশা অনুযায়ীই যে সবকিছু হবে তা নয়। বরং হিংসা-বিদ্বেষ-লোভ বাদ দিয়ে সময়ের সঠিক ব্যবহার জরুরি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল-সম্পদ দেখেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল।'

মুসলিম হা/২৫৬৪, মিশকাত হা/৫৩১৪

হিংসুক ও বিদ্বেষী মানুষ কোনো অবস্থায় শান্তি পায় না। তার কোনো সৎ বন্ধু জোটে না। সে কখনোই সুপথপ্রাপ্ত হয় না। তার হৃদয়-মন থাকে সর্বদা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মতো। যেখান থেকে সর্বদা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, ধোঁকা ও মিথ্যাচারের দুর্গন্ধযুক্ত স্ফুলিঙ্গসমূহ বের হয়। সে সর্বদা নিজেকে বিজয়ী ভাবে। অথচ সেই-ই সবচেয়ে পরাজিত। সময় তাকে পরাজিত করবেই। আমৃত্যু সে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। মনে রাখবেন হিংসা-বিদ্বেষ অন্যকে হত্যা করার আগে নিজেকে হত্যা করে।

সৎকর্মশীল ইমানদাররা কখনো কাউকে হিংসা করেন না। কারো প্রতি বিদ্বেষী হন না। বরং তার জীবনে ভালো সময় আসুক কিংবা খারাপ সময়-উভয় অবস্থায় মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে। তারা খারাপ সময়কে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে থাকে। অবশেষে মহান আল্লাহ তাদেরকেই বিজয়ী করেন। আর হিংসুককে করেন পরাজিত। যুগে যুগে এটাই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

হিংসার শুরু ইবলিশ থেকে। আল্লাহতায়ালা আদম (আ.)কে সৃষ্টি করলেন। ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন সিজদা করতে। সকল ফেরেশতা সিজদা করল। কিন্তু এই ইবলিশ চিন্তা করল এই সম্মান তো আমার প্রাপ্য, সে সম্মান আদম কেন পেল? সে হিংসায় সে সিজদা থেকে বিরত থাকল। আর এই হিংসার কারণে তার মনে অহংকার সৃষ্টি হলো। শেষ পরিণতি হিসেবে তার হাজার বছরের এবাদত ধ্বংস হয়ে গেল।

তবে ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হিংসার ঘটনা ঘটিয়েছে ইহুদিরা, তারা মনে করত তাদের মধ্য থেকে শেষ নবী আসবে। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর দুজন ছেলে ইসহাক ও ইসমাইল। ইসহাক (আ.)-এর বংশে আল্লাহতায়ালা অনেক নবী প্রেরণ করেন। কিন্তু ইসমাইল (আ.)-এর বংশে কোনো নবী আসেনি, তখন ইহুদিরা ভাবত শেষ নবী ইসহাক (আ.)-এর বংশে জন্ম নেবে, কিন্তু সে চিন্তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে যখন আখেরি নবী হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশে জন্ম নিল, ইহুদি পণ্ডিতরা হিংসার বশবর্তী হয়ে সত্য ধর্ম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত থাকল। তাদের হিংসা ইহুদিদের মধ্যে আজো বিদ্যমান।

হিংসুক ব্যক্তি অন্যকে ক্ষতি করার আগে সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা শুরুতেই সে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। হিংসা দূর না হওয়া পর্যন্ত এটাই তার জন্য স্থায়ী দুনিয়াবি শাস্তি।

আপনি যদি আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্যটি পূরণ করেন তবে সেদিন আপনার পৃথিবী দেখতে কেমন হবে? দীর্ঘমেয়াদে আপনার নিজের জন্য ও পেশাগত জীবনের জন্য আপনার রূপকল্প কী? আপনার সংকল্প কী? আপনি অন্যদের জীবনের মান উন্নয়নে ভিন্ন কী কাজ করছেন?

আপনি যদি কেবল আপনার নিজের ও সাংসারিক জীবনের ব্যয় নির্বাহের জন্য কাজ করে যান তবে আপনি উচ্চমানের সন্তুষ্টি ও আগ্রহ অর্জন করতে পারবেন না। আপনাকে অবশ্যই এমন কোনো কাজ করতে হবে যা আপনার চেয়ে বড়, মহান এবং অন্যদের জীবনে একটি ইতিবাচক ও মহৎ অবদান রাখে।

নিজেকে পরীক্ষা করুন

আপনি যখন কী করবেন এই বিষয়ে পরিষ্কার ও নিশ্চিত তখন আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন, 'আমি কীভাবে এটা সম্পন্ন করব?'

যখনই এই প্রশ্ন আপনার মাথায় আসবে তখন আগে দুটি প্রশ্ন নিজেকে করুন-

১. *আমি এখন কোন পরিস্থিতিতে আছি?*

২. *আমি কি ঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছি?*

এই দুই প্রশ্ন সম্পর্কে নিশ্চিত হোন।

আপনি যখন নিজের পরিস্থিতি ও ঠিক পথ সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন তখন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, 'এখন কী করা যায়?'

এবার নিজেকে আবার প্রশ্ন করুন-

১. আমি যা করছি তা কি আমাকে দ্রুত ও দক্ষতার সাথে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে?

২. আমি কি আমার অগ্রগতির পথে সন্তুষ্ট?

৩. সবকিছু ঠিকঠাক চলছে তো, নাকি আমি অনেক বেশি বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছি?

এবার আপনার কাজের পদ্ধতিসমূহ নিয়েও প্রশ্ন তুলুন। আপনি যত প্রশ্ন তুলবেন আপনার আত্মপরিশুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা তত বাড়বে।

মানুষের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী হলেন আল্লাহতায়ালা। মানুষের দুনিয়ার জীবন সুন্দর এবং পরকালকে সার্থক করে তুলতে রয়েছে কোরআন-হাদিসে অনেক সুস্পষ্ট নির্দেশনা। হাদিসে গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশনা প্রদান করেছেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যা তুলে ধরা হলো-

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর কর্তব্য।

>> যে ব্যক্তি রক্তমূল্য আদায় করে মুক্তিলাভ করতে চায়, ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহতায়ালার নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করেন।

>> দুনিয়ার জীবনে পাশবিকতার উচ্ছৃঙ্খলপনা থেকে নিজেকে হেফাজত করতে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিবাহ বন্ধে আবদ্ধ হতে চায়, তাদের সাহায্য করাও আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়।

>> ওই ব্যক্তিদের সাহায্য করাও আল্লাহতায়ালার দায়িত্ব, যারা আল্লাহর বিধানগুলোকে পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করতে অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এসব লোকদের সাহায্য করা আল্লাহতায়ালার কর্তব্য হয়ে যায়। আপনাকে আপনার নির্ধারিত সময় এমনভাবে কাটাতে হবে যেন প্রতিটি দিনই আপনি মহান আল্লাহতায়ালার পথে নিজেকে নতুন করে সাজাতে পারেন। মহানবী (সা.) বলেন-

'যার দুটি দিন একই রকম কাটল, সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।'

(অর্থাৎ, যে আজকের দিনটিকে গতকালের চেয়ে বেশি কাজে লাগাতে পারল না, সে উন্নতি করতে পারল না)

আপনার কাজ ও জীবন নির্বাহের পদ্ধতিসমূহ কী? আপনি কি পদ্ধতিসমূহ পরিমাপ করতে পেরেছেন? ব্যাপারটি আপনার অজানা রয়ে গেছে কি? কোন ব্যাপারগুলো আপনার অগোচরে রয়ে গেছে? আপনি দেখে অবাক হবেন যে বহু পরিশ্রমী লোক ভুল পদ্ধতিতে জীবন নির্বাহ করছে এবং এই ব্যাপারে তাদের কোনো প্রশ্নও নেই। তাই প্রশ্ন করতে শিখুন ইসলামের দেখানো পথে। নিজেকে তৈরি করুন হিংসা, বিদ্বেষ ও লোভবিহীন মানুষ হিসেবে। ইমাম গাজ্জালি বলেন-

'তিনটি বস্তু মানুষকে ধ্বংস করে দেয়:
লোভ, হিংসা ও অহংকার।'

১০
প্রকল্প হবে ভবিষ্যৎমুখী

ইসলাম শব্দের অর্থ আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া। তাই সব কাজের মতো সময়-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও একজন মুসলিমকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা স্মরণ রাখতে হবে। আখিরাতের সাফল্য-ব্যর্থতাকে সামনে রেখেই দুনিয়ার সাফল্যের রোডম্যাপ আঁকতে হবে। যারা আখিরাতের কথা ভুলে যাবে তাদের সম্বোধন করে আল্লাহ কেয়ামতের দিন বলবেন-

'তোমরা কি ভেবেছিলে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?'

(সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১১৫)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বিভিন্নভাবে সময়ের কসম করে এর গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। সময়ের সদ্ব্যবহার না করে মানুষ ক্ষতিকর কাজে ডুবে আছে এমন অভিযোগ করে আল্লাহ বলেন-

'কালের শপথ, মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।...'

(সুরা আসর, আয়াত : ১-২)

এসব প্রশ্নের আলোকেই মুমিনের সময় ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজাতে হবে। অনর্থক ও গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করতে হবে এবং সময়ে বরকতদানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। সর্বোপরি, সময়ের যথাযথ ব্যবহার মুমিনের জীবনকে যেমন রাঙিয়ে তুলবে, আখিরাতকেও করবে সাফল্যমণ্ডিত।

যেকোনো ক্ষেত্রে বা পেশায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কোন কাজটি আপনি করতে পারেন? এটা হচ্ছে চিন্তা করা। কারণ আপনি যদি কী করবেন ও কীভাবে করবেন এটা চিন্তা করে কাজ করেন তবে আপনি যে অসাধারণ ফলাফল পাবেন তা অনুমানভিত্তিক বা তাড়াহুড়া করে করা কাজের সাথে তুলনাই হয় না। সবকিছুর মূলেই তো ফলাফল, একটি কার্যকর ও আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল। তাহলে সেই ফলাফল লাভ করার জন্য কিছু সময় নিয়ে চিন্তা করা সময়ের অপচয় নয়; বরং মুনাফাজনক।

এজন্যই কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে 'ধীরে চিন্তা' করার অভ্যাস গঠন করতে হবে। এতে করে আপনি আপনার সম্ভাবনাময় শক্তিকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে পারবেন।

আপনি আপনার জীবন যেভাবে সাজাতে চাইবেন জীবন আপনার সেভাবেই গড়ে উঠবে। অর্থাৎ আপনি সহজভাবে সঠিক সময়ের ব্যবহার করতে শিখুন।

'প্রতিটি মানুষ তার কাজের সেই ফলই পাবে,
যা সে নিয়ত করেছে।'

-বুখারি

ব্যক্তিগত উন্নয়নের বই পাঠের বিকল্প নেই। বিভিন্ন বই পড়লে আপনার মধ্যে সৃজনশীল চিন্তার উদ্ভব ঘটবে। আপনি নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করবেন যা পূর্বে কখনো দেখেননি। এটাই

ব্যক্তিগত উন্নয়নে বই পাঠের সার্থকতা। যদিও আমরা কেবল নির্দিষ্ট কিছু বইয়ের মধ্যে আমাদের জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি। বিশেষ করে পাঠ্য বইয়ের মধ্যেই আমাদের পড়ালেখা সীমাবদ্ধ করে রাখি। আমরা ইসলামিক শিক্ষাও নেই সীমিত। আমরা ধরেই নিই ইসলামিক সকল শিক্ষা গ্রহণ করার দায়িত্ব কেবল ইমাম-মৌলবিদের। কিন্তু প্রতিটি মুসলিমের জন্য ইসলামিক শিক্ষা ফরজ।

ইসলামে জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তো ইসলামে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। পবিত্র কোরআনে নামাজ পড়ার কথা ৮২ বার তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং জ্ঞানচর্চার ওপর তাগিদ দেয়া হয়েছে ৯২ জায়গায়।

নবীর (সা.) প্রতি মহান আল্লাহর প্রথম আদেশই হলো, (ইকরা) পড়ো। মহান আল্লাহতায়ালা বলেন-

'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।
পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহাদয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

সুরা আলাক, আয়াত ১-৫

প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় বেছে নিন। এই সময়গুলোতে আপনার লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও আপনার অগ্রগতি নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে কাজটি সম্পন্ন করেন। কোনো কাজ ফেলে রাখবেন না। কারণ আপনি থেমে থাকলেও সময় থেকে থাকবে না।

আপনার লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও আপনার অগ্রগতি নিয়ে গভীরভাবে ভাবার সবচেয়ে ভালো সময় হলো ফজরের নামাজের সময়।

ফজরের সালাত আদায়ের ফলে ব্যক্তির মন ফুরফুরে,
প্রফুল্ল হয়ে যায়।

(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)

সময় নিয়ে চিন্তা ও পরিকল্পনা করুন, স্বপ্ন দেখুন ও সৃষ্টি করুন। যত দক্ষ ও সফল পরিচালক ও ব্যবস্থাপক আছেন তারা সকলেই তাদের কাজ আরম্ভ করার আগে গভীর চিন্তাভাবনা করেন।

কয়েকটি প্রশ্ন কেবল আপনার জন্যই। আপনি কি এ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবনী কখনো পড়েছেন? কখনো কি আপনার ইচ্ছে হয়েছে, কেমন ছিলেন তিনি? কেমন ছিল তার সংসার জীবন? তার রাজনৈতিক জীবন? তার বেশভূষা? কিংবা তার আচার ব্যবহার? কখনো কি আপনার মনে প্রশ্ন জেগেছে কেন তিনি এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব? কেন তাকে এ বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে মহান আল্লাহ তৈরি করেছেন?

আপনার হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর যা পাবেন, সবই আপনার জন্য আদর্শ। তার প্রতিটি আচরণ আপনার জন্য উত্তম। তার জীবন চলার আদেশ-নিষেধ আপনার জন্য উত্তম জীবন ব্যবস্থা। তাই সবচেয়ে ভালো হয় এই ক্ষেত্রে মহানবী হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর জীবনী পড়ে নেয়া। কারণ তার জীবনটা এমন যেখানে কোনো ভুল নেই। কোথাও সামান্যতম ছেদও নেই।

মহানবী (সা.) জীবনী পড়ার পর এবার একটু সময় নিয়ে আপনার জীবন ও কর্ম নিয়ে চিন্তা করুন। বৃহৎ চিত্রটি দেখার চেষ্টা করুন। আজকের কথা চিন্তা করুন। পাঁচ বছর পরে আপনি কোথায় থাকতে চান তাও ভাবুন। আজকের কাজকর্মের দিকে তাকান। দেখুন তো কোন কাজগুলো আপনাকে ভবিষ্যতে এগিয়ে নিয়ে যাবে বা আপনি যা চান তার দিকে ধাবিত করবে। এভাবে চিন্তা করলে আপনি পূর্বের তুলনায় অনেক ভালোভাবে ও দক্ষতার সাথে আপনার সময়কে পরিচালিত করতে পারবেন। এবং মহানবী (সা.) সময়কে কীভাবে ব্যবহার করতেন তার পদ্ধতির সাথে আপনার পদ্ধতির ফারাক খুঁজে বের করুন। যা হয়তো আপনি এখন কল্পনাও করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি সঠিক সময় ব্যবহারের পথ পেয়ে যাবেন।

তার জীবনীর অন্যতম প্রধান দিক তিনি তাড়াতাড়ি ঘুমোতেন। রাত্রির শেষাংশে জেগে উঠতেন। বিজ্ঞান বলে শেষ রাতের বিশেষ গুণ হলো মস্তিষ্কের চিন্তাধারা এ সময়ই সবচেয়ে বেশি সচল থাকে। সতেজভাবে চিন্তা করা যায়। যদি খুব ভোরে ওঠেন তাহলে কাজ করার জন্যও আপনি অনেক বেশি সময় পাবেন।

ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার বই হ্যাল অ্যালরডের 'দ্য মিরাকল মর্নিং'-এ তিনি যা বলেছেন তার সবই মূলত ফজরের নামাজের উপকারিতা। মজার ব্যাপার হলো, বইটাতে অনেক মনীষীর উক্তি থাকলেও মহানবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর কোনো উক্তি নেই। যদিও এই বইতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার সবই ১৪০০ বছর আগে হাতে-কলমে মহানবী (সা.) দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

মনে রাখবেন আজকে দিনটাই হতে পারে আপনার জীবনের বিশেষ দিন। তাই আজই একটি উত্তম সিদ্ধান্ত নিন।

ইমাম গাজ্জালি (রা.) বর্ণনায় একটি ইসলামিক শিক্ষণীয় গল্প

একজন বাদশাহের একটি বড় ফলের বাগান ছিল। বাগানটি ছিল বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট অর্থাৎ বাগানের কিছু অংশে আপেল, কিছু অংশে কমলা, কিছু অংশে বেদানা, কিছু অংশে আঙ্গুর ইত্যাদি গাছে ভরপুর।

বাদশাহ একজন প্রহরীকে ডাকলেন। প্রহরীর হাতে একটি ঝুড়ি দিয়ে আদেশ দিলেন, ঝুড়ি ভরে ফল আনার জন্য। সাথে বলে দিলেন যদি সুমিষ্ট এবং ভালো ফল আনতে পারে তাহলে তাকে বিশেষ পুরস্কার হিসেবে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হবে। তবে বাদশাহ প্রহরীকে সাথে একটি ছোট্ট শর্তও জুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, শর্ত হলো বাগানের একই অংশে দুবার হাঁটা যাবে না এবং সময় থাকবে ২০ মিনিট। আর ভালো ফল আনতে না পারলে ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে।

প্রহরী ভাবল এ আর কঠিন কাজ কি? পুরো বাগান ঘুরতে বড়জোর ১৫ মিনিট লাগবে আর বাগানের সামনের রাস্তা দিয়ে ঢুকব পেছনের রাস্তা দিয়ে বের হব- ব্যস, তাহলেই তো হয়ে যাবে।

প্রহরী ঝুড়ি হাতে সামনের রাস্তা দিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ল। দেখল বাগানের সব ফল পেকে আছে। সে যেই অংশে প্রবেশ করল সেখানে দেখতে পেল অনেক সুন্দর সুন্দর নানান জাতের আপেল ফল পড়ে আছে। কিন্তু প্রহরী ভাবল অন্যদিকে গিয়ে দেখে আসি হয়তো আরো ভালো আপেল ফল পেতে পারি। সে সামনে এগিয়ে গেল। এভাবে সে আরো ভালো ভালো ফলের সন্ধান পেল। কিন্তু সেগুলো আপেল ফল ছিল না। সেগুলো ছিল কমলা। সে ভাবল আরো সামনে হয়তো আরো ভালো ফল একসাথে পাবে। তাই সে সামনে এগিয়ে গেল। কিন্তু সে আঙ্গুর ফল খুঁজে পেল। সেখান থেকে সে সামান্য কিছু ফল সংগ্রহ করে নিল এবং ভাবল এখনো তো অনেক সময় বাকি। শেষের দিকে অবশ্যই ভালো ফল পাব। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল একি অবস্থা! বাগানের এই অংশে কোনো ফল নেই।

এবার প্রহরী কাঁদো কাঁদো হয়ে ভাবতে লাগল, ইস! আমি যদি বাগানের প্রথম থেকেই ফল সংগ্রহ করে নিতাম তাহলে আমাকে রিক্তহস্তে ফিরে যেতে হতো না। এখন বাদশার বেত্রাঘাত খেতেই হবে।

ইমাম গাজ্জালি (র.) ওই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, প্রিয় বন্ধুরা বাগানের সেই প্রহরী হলে তুমি আর বাদশাহ হলো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ।

ওই বাগানের মতো আমাদের জীবনেও আছে ভালো ও মন্দ। আর বাগানে যেমন মাত্র সামনের রাস্তার আর পেছনের রাস্তা ছিল তেমনি আপনার জীবনেও জন্ম আর মৃত্যু-দুটি দরজার মতো। একবার এক দরজা দিয়ে ঢুকলে অন্য দরজা দিয়ে বের হতেই হবে। দ্বিতীয়বার উল্টো দিকে আসার সুযোগ নেই। তাই আমাদের ভালো কাজ আগে করতে হবে। আজকের কাজ আজই শেষ করতে হবে। কিন্তু আমরা প্রতিদিন ভাবি অনেক সময় আছে। তাই ভালো কাজ শুরু করব করব করেও করা হয় না। এরপর ভাবি কাল থেকে করব, পরদিন ভাবি আজ না আগামীকাল অবশ্যই করব।

টাইম ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে বড় সমস্যাই হলো আজকের 'কাজ' 'কাল' থেকে শুরু করা। অনেক সময় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে গ্রহণ করলেও সময়ের সঠিক ব্যবহার শুরু করা যায় না আজকের কাজ কাল থেকে শুরু করার অপেক্ষায়।

কাল হয়তো তুমি নাও পেতে পারো। কাল তুমি বাঁচবে তার নিশ্চয়তা কী? দুনিয়াতে একটা নির্ধারিত সময় বেঁচে থাকার পর মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়।

পবিত্র কোরআন শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কোটি কোটি মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, বদলে দিয়েছে ভেতর থেকে, খুলে দিয়েছে তাদের সম্ভাবনার দ্বার, দিয়েছে প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত জীবন। এই জীবনের সঙ্গে মৃত্যুও যে জড়িত তাও উল্লেখ করেছেন।

'আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেছেন। তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। আবার তিনিই তোমাদের পুনরুত্থিত করবেন। তারপরও মানুষ অতি-অকৃতজ্ঞ!'

(সুরা হজ, আয়াত ৬৬)

'নিশ্চয়ই কখন কেয়ামত হবে তা শুধু আল্লাহই জানেন। তিনি মেঘ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন। তিনি জানেন জরায়ুতে কী আছে। অথচ কেউই জানে না আগামীকাল তার জন্য কী অপেক্ষা করছে এবং কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু হবে। শুধু আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে অবহিত।'

(সুরা লোকমান, আয়াত ৩৪)

যখন আপনি নিশ্চিতভাবে জানবেন যে আপনি ভবিষ্যতে কী চান তখন আপনি সহজেই বর্তমানের সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারবেন। তবে যদি আপনার হায়াত থাকে তাহলে তা পূর্ণ হবে তখনই যদি কাজটা আজ থেকেই শুরু করেন। এটা আপনার জন্য সহজ ও সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। মূল কথা হলো সময় থাকতে আপনার সাধনার প্রয়োজন। যেহেতু সময় সীমিত। মহান আল্লাহ এই বিষয়ে বলেন-

'দুরাচারীরা কি মনে করে যে, তাদের জীবন ও মৃত্যু এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জীবন ও মৃত্যু একইরকম হবে? কত ভ্রান্ত ধারণা ওদের!'

(সুরা জাসিয়া, আয়াত ২১)

'নিশ্চয়ই মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না। কেউ পার্থিব পুরস্কারের জন্যে কাজ করলে তাকে তার পুরস্কার ইহকালে দান করব। আর যদি কেউ পরকালের জন্য কাজ করে তবে তার পুরস্কার সে পরকালে পাবে। শোকরগোজার বান্দাদের কাজের ফল আমি নিশ্চয়ই দেব।'

(সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৫)

'হে নবী! তোমার পূর্বেও আমি কোনো মানুষকে অমরত্ব দান করিনি। তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে?'

(সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৩৪)

'প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদের ভালো ও খারাপ অবস্থা দিয়ে পরীক্ষা করি। আর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।'

(সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৩৫)

'হে নবী ওদের বলুন যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাচ্ছ, তোমাদের সে মৃত্যুর মুখোমুখি হতেই হবে। শেষ পর্যন্ত তোমাদের হাজির করা হবে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছে। জীবদ্দশায় যা করেছ, তা তোমরা তখন পুরোপুরি জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে।'

(সুরা জুমআ, আয়াত ৮)

আপনি যদি আপনার লক্ষ্যবস্তু ঠিক না করে সামনে পা বাড়ান তবে আপনি কোথায় যাবেন? আপনার গতি কি বৃদ্ধি পাবে? আপনার নিজের যদি কোনো নির্দিষ্ট টার্গেট না থাকে তবে সময় ব্যবস্থাপনা করে কী লাভ?

আপনি জোরে জোরে হাঁটতে পারেন। কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা গন্তব্য না জানলে কোথায় যাবেন, কতক্ষণ এভাবে হাঁটবেন? তাই সময়কে মূল্যায়ন করুন, আজই, এখনই, এই মুহূর্ত থেকে।

'তোমার জন্ম হয়েছে পাখা নিয়ে, ওড়ার ক্ষমতা তোমার আছে। তারপরও খোঁড়া হয়ে আছো কেন!'

জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি, ফারসি কবি

১১
ইসলামিক কর্মপরিকল্পনা

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।'

(সুরা মুলক : আয়াত ২)

আল্লাহতায়ালা মানুষকে নির্ধারিত কিছুদিনের জন্য সময় দিয়ে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা দুনিয়ার এ নির্ধারিত সময়ের কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভর করবে। অথচ মানুষের কাছে দুনিয়ার সময়ের দাম অনেক বেশি।

মানুষের জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। সবার আয়ু নির্ধারিত। দুনিয়ার ছোট্ট জীবন শেষে রয়েছে পরকালের সীমাহীন জীবন। এ দুনিয়ায় কেউ চিরকাল থাকবে না।

সংক্ষিপ্ত এই সময়কে কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন? আপনি হয়তো সঠিক ব্যবহারের জন্য মনে মনে চিন্তা করেছেন। কিংবা রোজই নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন। কিন্তু তা কোনো কাজে আসে না। তাহলে সঠিক টাইম ম্যানেজমেন্টের উপায় কী? কারণ আপনার সঠিক টাইম ম্যানেজমেন্টের ওপরে এ কালের যেমন সফলতা নির্ভর করছে তেমনি পরকালের সফলতাও নির্ভর করছে। তাই দুই কালের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি।

আসল কথা হলো মনে মনে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করলে বা মনে মনে চিন্তা করলে তা অধিকাংশ সময় সঠিকভাবে পালন করা যায় না। সে ক্ষেত্রে কাগজে লিখে পরিকল্পনা তৈরি করুন। আজই মুখে মুখে পরিকল্পনা তৈরি করা বন্ধ করুন। এখন তো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি আরো সহজ। কারণ আপনার কম্পিউটারে কিংবা মোবাইল ডিভাইসেও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বা টাইম ক্যালেন্ডার তৈরি করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আপনি সহজেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় দেখতে ও ধরতে পারবেন। যত সফল সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি আছে তারা সকলেই ভালো পরিকল্পনাবিদ। আর তারা কাগজে লিখেই পরিকল্পনা করে তারা নানান ধরনের তালিকা করে। এটাকে নানান ভাগ-উপভাগে সাজায়। মুখ্য কারণগুলো বের করে এবং গৌণ ব্যাপারগুলোর দিকেও পর্যাপ্ত নজর দেয়।

কথায় আছে পরিকল্পনার এক-একটি মিনিট কর্মক্ষেত্রের দশ মিনিট করে সময় বাঁচায়। আপনি যখন কাজ শুরু করার পূর্বে কাগজে লিখে পরিকল্পনা তৈরি করবেন তখন আপনি শতগুণ বেশি বল পাবেন। আপনার পরিকল্পনা তৈরিতে এক-একটি মিনিট আপনার কর্মক্ষেত্রে দশগুণ বেশি সময় বাঁচাবে। চিন্তা না করে ভুল কাজ করার চেয়ে চিন্তা করে ঠিক কাজটি করাই উত্তম।

সবাই মৃত্যুবরণ করবে। মানুষ এক-একটি দিন অতিবাহিত করা মানেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। তাই জীবনের মূল্যবান সময়কে শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করতে হবে। তা হিসাব করে ব্যয় করতে হবে। ২৪ ঘণ্টা সময়ের রুটিন করে নিতে হবে।

ইসলামিক টাইম ম্যানেজমেন্টের অন্যতম শর্ত হলো আপনাকে সুবেহ সাদিকের সময় ঘুম থেকে উঠতে হবে। যদি নবী মুহম্মাদ (সা.)-এর সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে চান তবে দিনের শুরুটা সুবেহ সাদিকেই হতে হবে। আর আমরা প্রত্যেকে জানি সুবেহ সাদিকে ফজরের আজান হয়।

খুব ভালো হয় যদি মুয়াজ্জিনের ডাক আপনি নিয়মিত সাড়া দেন। অভ্যেস করে নিন। বিষয়টা একেবারেই সহজ।

সারাদিনের আপনার জরুরি সকল কাজ সকাল থেকেই শুরু করতে পারেন। এতে প্রস্তুতি নেয়ার বিষয়টা সহজ হবে। তবে মনে রাখবেন কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। আজেবাজে কাজ করে মুক্তাতুল্য মূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট করা যাবে না। এমনকি দেশের জরুরি খবরাখবরের পেছনে কত সময় ব্যয় করবেন, তাও নির্ধারণ করে নেয়া উচিত। সারাদিনের কর্মের মধ্যে অবশ্যই সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে হবে। কোনো কথা শুনে সত্য-মিত্যা যাচাই না করে প্রচার করা যাবে না।

'হে মুমিনরা! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বসো। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদের অনুতপ্ত হতে হয়।'

(সুরা হুজুরাত, আয়াত : ৬)

নবীজী (সা.) বলেছেন-

'কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে যা শুনে তা-ই বলে বেড়ায়।'

(মুসলিম, হাদিস : ৫)

কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা সময়ের অপচয়ে ক্ষেত্রে এ কাজগুলোই বেশি করে যাচ্ছি। অযথা নেট দুনিয়ায় পড়ে আছি। নিউজ পোর্টালের খবর ভাইরাল করে দিচ্ছি। সত্য-মিথ্যা কোনো কিছুরই কোনো খবর নেই। টাইম ম্যানেজমেন্টের এখন প্রধান বাধাই নেট দুনিয়ার উড়ো চটকদার খবর।

আপনার কর্মঘণ্টার অধিকাংশ সময় এখন নষ্ট হচ্ছে এসব বাজে কাজে। আর এসব বাজে কাজের কারণে আপনি নিজেই দিশেহারা। কোনো কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। জীবনে নেমে এসেছে পেরেশানি। আর কখনো জেনেবুঝে কিংবা না জেনে কোন কবিরাহ গুনাহের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন, তা নিজেও জানেন না।

সাধারণ অবসর সময়ে করণীয়

যদি আপনার অবসর থাকে তাহলে কী করবেন? অযথা আড্ডা দেবেন নাকি কোনো ভালো কাজের মধ্যে ডুবে থাকবেন?

পুরুষরা কাজে না গেলে ঘরে স্ত্রী-পরিজনকে সময় দেবেন। সৎ ও সভ্য স্ত্রীরা তার স্বামী থেকে কামনা করে থাকে যে তার স্বামী যেন তাকে পর্যাপ্ত সময় দেন এবং তার কাছে থাকেন। উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন-

'আমি একদা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উভয় জাহানের মুক্তির পথ কী, তা জানতে চাইলাম। উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) তিনটি উপদেশ দিলেন। তার একটি ছিল পরিবারের সঙ্গে তোমার অবস্থানকে দীর্ঘ করবে।'

(তিরমিজি, হাদিস : ২৪০৬)

এখানে পরিবারের সাথে থাকার বিষয়টা ভেবে দেখার বিষয়। কারণ পরিবারের সঙ্গে অবস্থান যেন নিছক দৈহিক উপস্থিতিই না হয়। যেমন ঘরে তো আছেন কিন্তু টিভি, মোবাইল, ব্যক্তিগত কাজ বা স্ত্রীর কাজে ভুল ধরতে এতটাই নিমগ্ন, যা পরিবারের জন্য আরো বেশি ক্ষতির কারণ হবে।

এ ক্ষেত্রে ঘরোয়া কাজে সহযোগিতা করা যায়। ঘরোয়া কাজে সহযোগিতা করা অনেকের কাছে কিছুটা লজ্জার বিষয় মনে হয়। এটি ঠিক নয়। নবীজীর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হয়, নবীজী কি ঘরোয়া কাজে সহযোগিতা করতেন? তিনি বলেন-

'হ্যাঁ, নবীজী ঘরের লোকদের কাজে সহযোগিতা করতেন এবং নামাজের সময় হলে নামাজের জন্য যেতেন।'

(বুখারি, হাদিস : ৬৭৬)

ঘরে থেকে স্ত্রীদের সঙ্গে হাসি-মজা করা যায়। মুখেও মহব্বত প্রকাশ করা যায়। অনেকে স্বীয় স্ত্রীকে সীমাহীন ভালোবাসেন। অনেক সময় ভালোবাসার কথার জানানও দেন। কিন্তু মুখে প্রকাশ করাটাকে লজ্জার বিষয় মনে করেন। অথচ নবীজীর সুন্নত মুখেও ভালোবাসার কথা প্রকাশ করা। খাদিজা (রা.) সম্পর্কে নবীজী (সা.) বলেছেন-

'আমার মনে তার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেয়া হয়েছে।'

(মুসলিম, হাদিস : ২৪৩৫)

আয়েশা (রা.) বলেন-

'রাসুল (সা.) ভালোবেসে কখনো কখনো আমার নাম হুমায়রা বা লাল গোলাপ বলে ডাকতেন।'

(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৪৭৪)

আয়েশা (রা.) আরো বলেন-

'পাত্রের যে অংশে আমি মুখ রেখে পানি পান করতাম তিনি সেখানেই মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে পছন্দ করতেন।'

(মুসলিম, হাদিস : ৩০০)

আয়েশা (রা.) বলেন, কখনো কখনো আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতাম এবং আমাকে খুশি করতে তিনি প্রতিযোগিতায় ইচ্ছা করেই নিজেকে পেছনে ফেলে দিতেন। এছাড়া একই সঙ্গে গোসল করা, একই প্লেটে খাবার খাওয়া, একই চাদরে রাত্রিযাপনসহ অসংখ্য রোমান্টিকতায় ভরপুর ছিল নবীজীর দাম্পত্য জীবন।

আপনার ভালোবাসাময় জীবনটাও উপভোগের বিষয়। শুধু কাজের মধ্যে ডুবে থাকার নাম টাইম ম্যানেজমেন্ট নয়। অনেকেই মনে করে থাকেন ঘরোয়া বিষয়গুলোতে সময় দেয়া মেয়েলি ব্যাপার। বরং তারা অফিসে কিংবা বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পছন্দ করেন। এসব আড্ডার উদ্দেশ্য টাকা ইনকাম করা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, টাকাই সুখের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। অর্থ সম্পদই কেবল সুখের একমাত্র অবলম্বন তো নয়ই।

১২

সময়ের সঠিক ব্যবহারে জীবনে সফলতা অর্জন

আমাদের জীবন সামান্য কিছু সময়ের সমষ্টিমাত্র। তাই আপনি যদি মানুষের ভাষার প্রতি মনোযোগ দেন তবে আপনি তাদের দ্বিধা এবং ভয় যথেষ্ট পরিমাণে পড়তে পারেন। একজন মানুষ নিজের সম্পর্কে কী ভাবেন, তার পদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনি কতটা ইতিবাচক, তার সাহস, যে বিষয়গুলো নিয়ে তিনি ভয় পান, এই সমস্ত জিনিস ধীরে ধীরে এবং ধীরে ধীরে তার ভাষা ও অভ্যাসগুলোতে প্রতিবিম্বিত হতে শুরু করে। জীবনে সাফল্য অর্জন করার জন্য আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে যত্ন নেয়া দরকার। কারণ দুনিয়ার এই ক্ষণিক মুহূর্তেও এমন কে নেই, যে সফলতার সুধা পান করতে চায় না। কোনো ব্যক্তি যখন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে তিনিই সফল। এটাই তার সফলতা।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ মানবজীবনের সফলতার মানদণ্ড ঘোষণা করেছেন-

'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।'

(সুরা মুলক, আয়াত-২)

মানুষের জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি সৎ আমল করে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ। অথচ আমাদের কারো কাছে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের নাম সফলতা। আবার অনেকের কাছেই বিপুল পরিমাণ বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়া। কিংবা বিপুল সুনাম অর্জনের নামই সফলতা। বলা হয়ে থাকে দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত।

ক্ষণিক জীবনে সময়ের সঠিক ব্যবহারই পারে সফলতার মুখ দেখাতে। তাই সফলতা পেতে অবশ্যই আপনাকে চারটি জিনিস বর্জন করতে হবে। তবেই সময়ের সঠিক ব্যবহারের মূল্যায়ন পাওয়া সম্ভব।

১. মেজাজ ঠিক করুন

২. পাছে লোকে কিছু বলে

মেজাজ ঠিক নাই

আপনি কোনো রাস্তা পার হচ্ছেন, হঠাৎ করেই আপনি দেখতে পেলেন একটি পাগলা কুকুর আপনাকে কামড়ানোর জন্য ছুটে আসছে, আপনি কি তখন বলতে পারবেন, এই মুহূর্তে আমার মেজাজ ঠিক নাই।

কিংবা ধরুন একটা লঞ্চে উঠেছেন। হঠাৎ লঞ্চের তলা ফুটো হয়ে গেল। আপনি বুঝতে পারছেন লঞ্চ ১০ মিনিটের মধ্যে ডুবে যাবে। তখন কি আপনি বলবেন আমার মেজাজ ঠিক নাই। এখন সাঁতরাতে পারব না, লাইফ জ্যাকেট পরতে পারব না।

কিংবা ধরুন আপনি রোজা আছেন। দিনটাও বেশ চড়া ছিল। আপনার গলা শুকিয়ে আসছে। ইফতারের সময় আপনি কি বলবেন, এখন পানি পান করার ইচ্ছে নেই। মেজাজ ঠিক নাই।

আপনি যখন এমন জায়গাগুলোতে মেজাজ নামক কোনো জিনিস মনে করার স্বপ্নও দেখতে পাচ্ছেন না, তখন আপনি কীভাবে সেই শব্দটি আপনার ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করতে পারেন?

প্রয়োজনীয় কাজের জন্য মেজাজের কোনো সমস্যা নেই। কাজ শুরু করুন, মেজাজ আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। কিছুদিন হলো আমি কিছু লিখতে পারছিলাম না। বেশ কয়েকটা উপন্যাস অর্ধেক লেখার পর মনে হলো সঠিকভাবে লিখতে পারছি না। লিখতে বসলেই মনে হতো লেখার মুড নাই। আমি আসলে নিজেই ধোঁকা দিচ্ছিলাম। এটা শয়তানের বিশেষ একটি কৌশল। এমন অবস্থায় আমি চিন্তা করলাম যেভাবেই হোক শয়তানের এই ধোঁকা থেকে বের হতে হবে। আমি ঠিক করলাম টাইম ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের ওপরে ইসলামিক শিক্ষা নিয়ে একটা বই লিখব। শুরু করে দিলাম এবং কোনো অলসতা করিনি। শয়তান পরাজিত হলো।

আমার মনে হয় জীবনের সবক্ষেত্রে শয়তানকে পরাজিত করা অত্যন্ত জরুরি। পবিত্র কোরআনে 'শয়তান' (একবচন) শব্দটি ৬৩ বার আর 'শায়াতিন' (বহুবচন) শব্দটি ১৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে শয়তান মুমিনের প্রধান শত্রু। কোরআনের অসংখ্য স্থানে মহান আল্লাহ শয়তান সম্পর্কে মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

'আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(সুরা বাকারা, আয়াত : ১৬৮)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

'হে মুমিনরা! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'

(সুরা বাকারা, আয়াত : ২০৮)

শয়তানের সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ হলো মানুষের মাঝে ফেতনা সৃষ্টি করা। এ কাজ থেকেই মানুষকে বিরত থাকতে হবে। হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'শয়তান পানির ওপর তার সিংহাসন স্থাপন করে, তারপর সারা দুনিয়াব্যাপী তার বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। আর শয়তান সবচেয়ে বেশি নৈকট্যপ্রাপ্ত, যে মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি ফেতনা ('ফিতনা' শব্দটি আরবি ভাষার। এর অর্থ নৈরাজ্য, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অন্তর্ঘাত, চক্রান্ত, বিপর্যয়) সৃষ্টি করে। শয়তান সিংহাসনে বসে সবার ঘটানো ফেতনার বর্ণনা শোনে।

তার বাহিনীর একজন এসে বলে আমি অমুক কাজ করেছি, শয়তান বলে, তুমি তেমন কোনো কাজ করোনি। এভাবে শয়তান তার পাঠানো বাহিনীর অন্য শয়তানদের মন্দ কাজের বিবরণ শুনতে থাকে। যদি বাহিনীর একজন এসে বলে, 'আমি অমুকের সঙ্গে ধোঁকার আচরণ করেছি, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছি। এ কথা শুনে শয়তান তাকে তার কাছাকাছি টেনে নেয়। আর বলে তুমিই বড় কাজ করেছ। হাদিস বর্ণনাকারী আমাশ বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, অতঃপর শয়তান তাকে তার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নেয়।

(মুসলিম)

বদমেজাজ যে কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে তা একটু ভেবে দেখবেন। প্রচলিত একটি স্লোগান আমরা সবাই কমবেশি শুনেছি-'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।' কিন্তু আপনি বিষয়টা এক কান দিয়ে শুনে যদি অন্য কান দিয়ে বের করে দেন তাহলে আদতে কোনো লাভ হলো না। আপনাকে বিষয়টা অনুধাবন করতে হবে।

যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যেও ব্যয় করে এবং
ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।
(সুরা আলে-ইমরান আয়াত : ১৩৪)

সে প্রকৃত বীর নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
(বুখারি, মুসলিম ও মিশকাত)

যখন তোমাদের কারো রাগ হয় তখন সে যদি দাঁড়ানো থাকে, তবে সে যেন বসে পড়ে। যদি তাতে রাগ চলে যায় ভালো। আর যদি না যায়, তবে শুয়ে পড়বে।
(মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি, মিশকাত)

নিশ্চয়ই রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তান আগুনের তৈরি। নিশ্চয় পানির দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয় সে যেন অজু করে।
(বুখারি ও মিশকাত)

আর যারা কবিরা গোনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।
(সুরা আশ-শুরা আয়াত : ৩৭)

রাগান্বিত হওয়ার পরও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারাটাই খাঁটি মুমিনদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। তারা ক্রোধের সময় নিজেদের হারিয়ে ফেলে না বরং তখনো ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। তারা রুক্ষ ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের হয় না বরং নাম স্বভাব ও ধীর মেজাজের মানুষ হয়। তাদের স্বভাব প্রতিশোধপরায়ণ হয় না। তারা আল্লাহর বান্দাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করে এবং কোনো কারণে ক্রোধান্বিত হলেও তা হজম করে। এটি মানুষের সর্বোত্তম গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। কোরআন মজিদ একে অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছে।

আপনি বরং সহজভাবে কাজ শুরু করেন। মেজাজের গুরুত্ব কম দিন। আপনি কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পাবেন কাজের ক্ষেত্রে মেজাজ আপনার কাছে অস্তিত্বহীন শব্দ। এখন সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আপনি যেকোনো সময় কাজ করতে পারেন।

যদি একটি রাগের মুহূর্তে আপনি ধৈর্য ধরেন, তাহলে আপনি ১০০ দিনের দুঃখ থেকে মুক্তি পাবেন।
-চীনা প্রবাদ

১৩
পাছে লোকে কিছু বলে

পেছনে লোকে কী বলবে? এই নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কারণে অনেকে চ্যালেঞ্জ নিতে অস্বীকার করেন। তারা উদ্যোগ নেন না। মজার ব্যাপার হলো, যখন কেউ ব্যর্থ হয় তখন তাদের সবচেয়ে বড় ভয়-পাছে লোকে কী বলবে?

লোকেরা যা চায় তা বলতে দিন। আপনি আপনার মতো থাকুন। দু-চার দিন বলার পর আপনি আপনার মতো তারা তাদের মতো। কী আসে যায় তাদের চুগলখোরিতে। মনে রাখবেন চুগলখোরি ইসলামে বিশাল অপরাধ। যদিও টাইম ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে বড় বাধা এই চুগলখোর।

চুগলখোরের কারণে মানুষের মাঝে ফেতনা সৃষ্টি হয়। পরস্পরের ভালো সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। পারস্পরিক দুশমনি বৃদ্ধি পায়। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই চুগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন স্বয়ং প্রিয়নবী।

চুগলখোরের পরিচয়

>> হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাবধান! আমি তোমাদের জানাচ্ছি চুগলখোর কী? এ হচ্ছে কুৎসা রটনা করা; যাতে মানুষের মাঝে বৈরিতার সৃষ্টি হয়। তিনি আরো বলেছেন, কোনো ব্যক্তি সত্য কথা বলতে বলতে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়; আবার কেউ মিথ্যা বলতে বলতে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।

>> কোরআনুল কারিমে আল্লাহতায়ালা চুগলখোরদের নিন্দা জানিয়েছেন। কোরআনের এ আয়াত থেকেও চুগলখোরের পরিচয় প্রকাশ পায়। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'এবং অনুসরণ কোরো না তার; যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। পশ্চাতে নিন্দাকারী; যে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।'
(সুরা ক্বালাম : আয়াত ১০-১১)

হাদিসের অন্য জায়গায় এসেছে-

'কিয়ামতের দিন সবচেয়ে খারাপ লোকদের দলভুক্ত হিসেবে ওই ব্যক্তিকে দেখতে পাবে; যে ছিল দুমুখো, যে একজনের কাছে এক কথা, আরেকজনের কাছে আরেক কথা নিয়ে হাজির হতো।'

(মুসলিম)

চুগলখোর করাটা সমাজে এখন নেশার মতো হয়ে গেছে। এর পরচর্চা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চায়ের দোকানে, অফিস-আদালতে চলছেই। অন্যের কাছে নিজেকে আপন করে তুলতে বা নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে বা দুনিয়াবি সুযোগ-সুবিধা লাভে কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে এখন সবাই ব্যস্ত। এই নিকৃষ্ট অপরাধটাকে অপরাধ হিসেবে মনেই করছে না। অযথা অন্যের দুর্নাম করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করছে। তাই নিজে চুগলখোর করা থেকে মুক্ত রাখুন। আর চুগলখোরদের কাছ থেকে দূরে থাকুন। এতে আপনার মূল্যবান সময় বাঁচবে।

মনে রাখবেন, ত্রুটিগুলো সন্ধান করা, মুখোশধারী পরামর্শ দেয়া, ব্যঙ্গাত্মক হওয়া-আমাদের সমাজের একটি বড় অংশ এই বেতনভাতার চাকরির অধিকারী। এই জাতীয় লোকেরা কী বলে আপনি যদি মনোযোগ দেন তবে আপনি কিছু করতে পারবেন না।

করিতে পারি না কাজ
সদা ভয় সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে-
পাছে লোকে কিছু বলে।

কামিনী রায়, কবি

আমি করতে পারব না!

কিছু লোক কেবল নিজের ওপর আস্থা রাখে না। এই আস্থার অভাবের কারণে তারা হীনমন্যতা জটিলতায় ভোগে। এরা দায়িত্ব থেকে পালায়।

যেকোনো কাজের শুরুতেই যদি আপনি বলেন 'আমি করতে পারব না'। তাহলে দেখবেন আস্তে আস্তে তা আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। বরং আপনি 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করে দিন। হাজার হাজার মানুষ যা পারছে আপনি কেন তা পারবেন না? নিজেকে বারবার প্রশ্ন করুন। মনে সাহস রাখুন।

আর যদি তা না করেন, তবে সারাজীবন ধরে বারবার, জেনেশুনে ও অজান্তে এটি প্রয়োগ করে যাবেন। ফলাফল, কাজের ক্ষমতা হ্রাস পাবে, আপনি আপনার কর্তব্যগুলোর সাথে ন্যায়বিচার করতে পারবেন না। পরিশেষে ব্যর্থ হওয়ার কারণ বৃদ্ধি পাবে।

হীনমন্যতা মনের মধ্যে যতবেশি রাখবেন, জীবনে ব্যর্থতা ততবেশি বাড়বে। একসময় 'আমি করতে পারব না' এটাই হবে আপনার একমাত্র পরিচয়। বিষয়টা কিছুটা ভিক্ষুকের মতো। চলুন মহানবীর শিক্ষামূলক ভিক্ষুকের ঘটনাটা আগে জেনে নিই।

নবী হজরত মুহম্মদ (সা.) ভিক্ষাবৃত্তিকে অপছন্দ করতেন। কোনো ভিক্ষুক চোখে পড়লেই তাকে কাজের পথ দেখিয়ে দিতেন। আনাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.)-এর কাছে আনসারি এক লোক ভিক্ষা চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কিছু আছে কি?

সে বলল, একটি কম্বল আছে যার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছাই। একটি পাত্র আছে পানি পান করি।

নবীজী (সা.) বললেন, সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো।

লোকটি তা নিয়ে এলে রাসুল (সা.) হাতে নিয়ে বলেন, এ দুটি বস্তু কে কিনবে?

এক ব্যক্তি বলল, আমি এগুলো এক দিরহামে নেব।

তিনি দুবার অথবা তিনবার বললেন, কেউ এর অধিক মূল্য দেবে কি?

আরেকজন বলল, আমি দুই দিরহামে নিতে পারি।
ওই ব্যক্তির কাছে নবীজী তা বিক্রি করে আনসারিকে বলেন, এক দিরহামে খাবার কিনে পরিবার-পরিজনকে দাও। আরেক দিরহামে কুঠার কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো।
লোকটি তাই করল। রাসুল (সা.) নিজ হাতে হাতল লাগিয়ে বলেন, যাও, কাঠ কেটে এনে বিক্রি করো। পনেরো দিন যেন তোমাকে না দেখি।
লোকটি কাট কেটে বিক্রি করতে লাগল। অতঃপর সে আসল, তার কাছে দশ দিরহাম ছিল। সে এর থেকে কিছু দিয়ে কাপড় ও খাবার কিনল। রাসুল (সা.) বলেন, ভিক্ষা করে বেড়ানোর চেয়ে এ কাজ তোমার জন্য অধিক উত্তম।
(তিরমিজি : ১২১৮)

'আমি পারব না' কথাটাও ভিক্ষুকের মতোই। কারণ ভিক্ষুক জীবনের সব ইচ্ছেশক্তি হারিয়ে ফেলে। নেতিবাচক মানসিকতা না হলে কেউ ভিক্ষা করতে পারে না। এটি একটি আত্মঘাতী বক্তব্য এবং ধীরে ধীরে আপনার খ্যাতির ক্ষতি করবে। আপনি নৈতিকভাবে দুর্বল ও দুর্বল বোধ শুরু করবেন যা অবশ্যই আপনার পতনের কারণ হবে। এই মুহূর্তে, আপনাকে অবশ্যই এই লাইনটি বাদ দিতে হবে এবং নতুনটিকে গ্রহণ করতে হবে যা এইভাবে চলেছে, 'যদি অন্য কেউ এটি করতে পারে তবে আমিও এটি করতে পারি'।

আমার দুর্ভাগ্য!

ভাগ্য আসলে কী? এই প্রশ্ন করে বিতর্ক বাড়াতে চাই না। তবে এতটুকু মনে রাখবেন, এই পৃথিবীতে খুব কম লোকই রয়েছে যারা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সংকল্প নিয়ে কাজ করে এবং তারা এখনো ব্যর্থ হয়। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি একটু ভালোভাবে জেনে নিই। তকদির বা ভাগ্য দুই প্রকার-

১. মুবরাম : এর অর্থ স্থিরকৃত।

২. মুআল্লাক : এর অর্থ পরিবর্তনীয়।

মহান আল্লাহতায়ালা ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন, তিনি পরিবর্তন করারও ক্ষমতা রাখেন। ভাগ্য নেক আমল, পিতা-মাতার দোয়া ও দান-সদকা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তন হয়।

ভাগ্য মানুষের অজানা বিষয়, আমরা জানি না তা স্থির নাকি পরিবর্তনীয়। সুতরাং আমাদের নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। নেক আমল করতে থাকা চাই। যাবতীয় কল্যাণকর বিষয়ের জন্য সদা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাওয়া উচিত।

মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে। তবেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আমাদের তকদিরকে সৌভাগ্যে পরিণত করে দেবেন। আর এ কথা মনে রাখবেন, কর্মই ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক। কারণ মহান আল্লাহতায়ালাই ঘোষণা দিয়েছেন-

'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'

(সুরা রাদ, আয়াত : ১১)

বিশ্বাসীদের বলছি, যেকোনো পরিস্থিতিতে আপনাকে লড়াই করতে হবে এবং কাজ করতে হবে, ভাগ্য আপনার পক্ষে হোক বা না হোক। যদি আপনি কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যান এবং ভাগ্য আপনার পক্ষে, তবে আপনি প্রত্যাশার বাইরেও সফল হতে পারবেন।

অন্যদিকে আপনি যদি আপনার কঠোর ভাগ্য সত্ত্বেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান, ব্যর্থতার শতাংশ অবশ্যই হ্রাস পাবে এবং ন্যূনতম আংশিক সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। যাই হোক না কেন, যেকোনো পরিস্থিতিতে, কঠোর পরিশ্রম সবসময়ই করা উচিত। কখনো প্রচেষ্টা ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

'তোমার হৃদয়ে যদি আলো থাকে, তাহলে ঘরে ফেরার পথ তুমি অবশ্যই খুঁজে পাবে।'

জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি, একজন ফারসি কবি

১৪
সময় ও সৌভাগ্য

'একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে।
পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা বদ আমলে কাটিয়েছে বা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে।'
(তিরমিজি : ২৩২৯, মুসনাদে আহমাদ : ১৭৭৩৪, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৬:১১১, মিশকাত : ২২১০, সহিহ আলবানি)

পরকালে মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। মানবজাতির জীবন পরিচালনার আদর্শ গাইডলাইন মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি আল্লাহতায়ালা সময় বোঝানোর জন্য কোরআনে অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, তিনি সূর্যকে করেছেন তেজোদ্দীপ্ত, আর চন্দ্রকে করেছেন আলোকময়। আর তার (হ্রাস-বৃদ্ধির) মানজিলসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা (এ নিয়ম দ্বারা) বছরের গণনা এবং দিন-তারিখের হিসাবটা জানতে পারো; (আসলে) আল্লাহতায়ালা যে এসব কিছু সৃষ্টি করে রেখেছেন (তার) কোনোটাই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি; যারা (সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে) জানতে চায় তাদের জন্য আল্লাহতায়ালা তার নির্দেশগুলোকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন।

আল্লাহতায়ালা আরো বলেন-

কালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে।
(সুরা আসর, আয়াত: ১-২)

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানে তা বহু সৃষ্টিকে নিয়ে কসম করেছেন, এতে এগুলোর মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে। তেমনি সময় নিয়ে কসম করায় এটি প্রত্যেক মানুষের জন্য কতগুণ গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়।

আল্লাহতায়ালা আরো বলেন- আমি রাত আর দিনকে দুটো নিদর্শন বানিয়েছি। আমি রাতের নিদর্শনকে জ্যোতিহীন করেছি আর দিনের নিদর্শনটিকে করেছি আলোয় উজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো। আর যাতে বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো; আমি সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি।

মোদ্দা কথা হলো জীবনের প্রতিটি 'সময়' আল্লাহর দেয়া বিশেষ নেয়ামত, এটি মানুষের জীবনে অমূল্য সম্পদ। যার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আল্লাহতায়ালা সুরা আসরের শুরুতে শপথ করেছেন। তাছাড়া আরো বিভিন্ন সুরায় আল্লাহতায়ালা দিনের শপথ, কখনো রাতের শপথ, আবার কখনো দ্বিপ্রহরের সময়ের শপথ, কখনো মধ্যরাতে, আবার প্রভাতের শপথ করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝাতে চেয়েছেন মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব অনেক বেশি।

ধরুন আপনি বাজারে গেলেন। বাজারে গিয়ে দেখলেন এক বরফ বিক্রেতা চিৎকারে করে বলছে, 'কে আছো পুঁজি হারানো লোকটির প্রতি রহম করো। কারণ সূর্য ওঠার সাথে সাথে তার বরফ গলতে শুরু করছে। অর্থাৎ তার পুঁজি গলে যাচ্ছে। আমাদের জীবনের সময় বরফ গলার মতো যা প্রতিনিয়ত গলে যাচ্ছে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিত তার জীবনের প্রতিটি সময়কে গুরুত্ব দেয়া।

পরকালে মানুষ যে বিষয়ে সবচেয়ে অনুতপ্ত হবে তা হলো, অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার না করা। সময়ে নেক আমল করলে বান্দার অবস্থার উন্নয়ন হবে, বদ আমল করলে তার অবনতি হবে। আমল ছাড়া সময় পার করলে তাও তার জন্য প্রকারান্তরে ক্ষতি হিসেবেই গণ্য হবে। কারণ মানুষের আয়ুষ্কাল প্রবহমান সময়। তা যদি সৎ কর্মে ব্যয়িত হয়, তবে নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে; আর যদি নেক আমলবিহীন চলে যায়, তা বদ আমল হিসেবেই পরিগণিত হবে। যেহেতু নিষ্ক্রিয়তা বা অকর্মণ্যতাও একটি ক্রিয়া।

প্রবাদে বলা হয় 'সময় স্বর্ণের চেয়েও মূল্যবান'। প্রকৃতপক্ষে সময় এর চেয়েও মূল্যবান। সময় নিয়ে আপসোস বিষয়ে কোরআনে দুটি বিশেষ সময়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত জীবনের অন্তিম মুহূর্ত। তখন সে আফসোস করবে, যদি তাকে একটুখানি সময় দেয়া হতো। যদি একটু সুযোগ দেয়া হতো তবে সে তার হারিয়ে যাওয়া অবস্থান ঠিক করে নিত। যেসব সময় সে অযথা নষ্ট করেছে তা সংশোধন করে নিতে পারত।

এই বিষয়ে কোরআনে বলা হয়েছে-

'হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

(সুরা আল-মুনাফিকুন : ৯-১০)

দ্বিতীয়ত আখিরাতের মুহূর্ত। আল্লাহ বলেন-

'সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের নিষ্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো, জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'

(সুরা আল-ফাতির : ৩৭)

সুতরাং মুসলমানের উচিত সময়ের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববান হওয়া। উদাসীনতা বা সময়ের প্রতি অবহেলা সম্পর্কে সাবধান করে আল্লাহতায়ালা আরো বলেন-

'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা সমাধিসমূহ দেখতে পাও (তোমাদের মৃত্যু হয়)। এটি কখনো সংগত নয়! অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। আবারো বলি, এটি মোটেই সমীচীন নয়; তা তোমরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে। না, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহগ্রস্ত হতে না। তোমরা (সময়ের প্রতি উদাসীন কর্মে অবহেলাকারীরা) অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে (তাতে প্রবেশ করবে)। পুনশ্চ! অবশ্যই অতি অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম চাক্ষুস দেখে (তাতে প্রবেশ করে তার শাস্তি ভোগ করে) প্রত্যয় লাভ করবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদিগকে প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।'

(সুরা ১০২ তাকাছুর, আয়াত: ১-৮)

আমরা প্রায় সময় নানান ব্যস্ততায় ব্যতিব্যস্ত থাকি। যেকোনো উপলক্ষে অবসর যখন আসে, তা আমাদের জন্য মহামূল্যবান নিয়ামত। সময় আমাদের জীবনের এমন একটি মূলধন বা পুঁজি, যা বিনিয়োগ করলে আমরা ইহকাল ও পরকালে লাভবান ও উপকৃত হব; আর এটি হেলায় নষ্ট করলে উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হব। সময় চলে গেলে তা আর কখনো ফিরে আসে না।

সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে সফলতা আসবেই। সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর উপায়গুলো নিম্নরূপ :

১. সময় কাজে না লাগানো :

সময়কে কোনো কাজে না লাগানোকে বলা যেতে পারে 'সময় হত্যা'। যদিও আমরা মনে করে থাকি এই তো মাত্র দুই-চার মিনিট সময়ই তো নষ্ট করি? ব্যাপারটা কি তাই? একটা ছোট্ট হিসাব করা যাক। ধরুন আপনি রোজ ২০ মিনিট বিনা প্রয়োজনে সময় নষ্ট করেন আর ধরে নিলাম আপনি ৬০ বছর বাঁচবেন। তাহলে আপনি আপনার জীবনের তিন বছর বিনা প্রয়োজনে ব্যয় করলেন। যদি আপনি ধূমপায়ী হন এবং ধরে নিলাম আপনি গড়ে পাঁচটি সিগারেট খান আর প্রতিটি সিগারেট পানে আপনার সময় ব্যয় হয় তিন-চার মিনিট। তাহলেও জীবন থেকে আপনি তিনটি বছর কেবল অপব্যয় করে কাটালেন।

অনেকেই বলে থাকে সিগারেট খাওয়া তো হারাম না। বরং মদ খাওয়া হারাম। অনেকে বলে সুদ ঘুষের মতো বিষয় যেখানে হারাম সেখানে তো সিগারেট হারাম নয়। যুক্তিটা খুবই খোঁড়া।

যারা অপব্যয় করে, তারা তো শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অতি অকৃতজ্ঞ।

(সুরা : বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৭)

'আর তোমরা পানাহার করো; কিন্তু অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।'

(সুরা-৭ আরাফ আয়াত : ৩১)

'আর তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কোরো না। তোমরা সৎ ও সুন্দর কাজ করো; নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা সৎকর্মপরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন।'

(সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ১৯৫)

এভাবে মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত কী পরিমাণ সময়কে আমরা হত্যা করি, এক দিনের হিসাব টানলেই দেখবেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই মাথা ঘুরপাক খেতে বাধ্য হবে।

ধূমপানের একটা ভালো দিকও যদি দেখাতে পারেন তবে বলব ঠিক আছে, আর তা না হলে অবশ্যই অপচয়। আসুন ছোট্ট একটা হিসাব করি। মুখে মুখেই হিসাবটা করতে পারবেন। ধরুন আপনি সিগারেট খান আর তা মূল্য ১০ টাকা। বাজারে এর চেয়ে অনেক বেশি দামি সিগারেট আছে। যদি রোজ গড়ে ১০টি সিগারেট খান তাহলে আপনি দৈনিক অপচয় করেন ১০০ টাকা। বছরে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা। এটা খুব ছোট হিসাব। যদি বেশি দামি সিগারেট খান তবে তা লাখ টাকা পার হয়ে যাবে।

আপনি অপচয় করছেন?

নিশ্চিত এবং নিশ্চিত।

অথচ এই লাখ টাকা আপনি জাকাত দিতে পারতেন। কারণ অবশ্যই আপনাকে জাকাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। কারণ জাকাত ফরজ। মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কোরআনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় বিরাশি জায়গায় এ জাকাতের কথা বলেছেন। 'জাকাত' শব্দ দ্বারা ৩০ বার, 'আল ইনফাক' শব্দ দ্বারা ৪৩ বার, 'আস সাদাকাহ' শব্দ দ্বারা ৯ বার। ৩০+৪৩+৯ = ৮২ বার। এতবার যে বিষয়টি সম্পর্কে মহান রব বলেছেন অবশ্যই বিষয়টি খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে।

ইসলামি শরিয়তে নেশা সর্বৈব হারাম। জাহান্নাম বা দোজখের বৈশিষ্ট্য তিনটি : আগুন, ধোঁয়া ও দুর্গন্ধ। এই তিনটির সমাহার ঘটে ধূমপানে। তাই বিষয়টা নিয়ে নতুন করে ভাবতে পারেন।

২. সময়ে সঠিক কাজ করা :

ইসলামের মৌলিক শিক্ষাই হলো যখন যে কাজ তখন সেটি করা। যদি এমন না করেন তাহলে সব কাজ একসাথে চলে আসবে। তখন কোনটা বাদে কোনটা করবেন তা বুঝে আসে না। অনেক মানুষ সব কাজ জীবনের শেষে করতে চায়। নামাজ, রোজা কিংবা সৎকাজ যাই বলি না কেন, তারা বলে আরে এই বয়সে একটু আমোদ-ফুর্তি করে নিই। বুড়ো বয়সে করব। আপনাকে প্রথম প্রশ্ন-

ক. আপনার হায়াত কতটুকু তা কি আপনি জানেন?

খ. আপনার হায়াতের মধ্যে আপনি বুড়ো হবেন তা নিশ্চিত হলেন কী করে?

গ. আর হায়াতের মধ্যে যদি বুড়ো বয়সটা থাকেও তবে সেই বয়েসে আপনি সঠিক কাজ করতে পারবেন তার নিশ্চয়তা কী?

বাস্তবিকভাবে বুড়ো বয়সে কোনো কাজ সঠিকভাবে করা কঠিন। কারণ মন টানলেও শরীর টানে না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়'। তাই সময় থাকতেই ভাবতে হবে।

সালাতের সময় হয়েছে তো সালাত আদায় করে নেয়াটাই তখন কর্তব্য। যখন যে কাজের সময় তখন তা না করে অন্য কাজ করলে তাতে যথাযথ মনোনিবেশ থাকে না। ফলে কাজে ভুল, অসুন্দর ও বিলম্বিত হয়। অন্য সময়ে করতে গেলে উপায়-উপকরণ এবং সহযোগিতা না পাওয়ায় প্রচুর সময় অপচয় হয়।

৩. সময় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ :

ধরুন আপনি কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গিয়েছেন। নামাজের সময় হলো। আপনি অজু করতে বসেছেন সাগরের পানিতে। এবার আপনি কতটুকু পানি ব্যবহার করবেন? কারণ পানির তো কমতি নেই। উত্তর হলো ইচ্ছেমতো পানি ব্যবহার করা যাবে না। ইসলাম এটাকে মাকরুহ বলেছে।

একইভাবে আপনি দায়িত্বশীল পদে আছেন। ধরে নিলাম আপনি সৎ এবং ঘুষও খান না। কিন্তু জনৈক ব্যক্তির ফাইল সবকিছু ঠিক আছে তারপরও আপনি দুদিনের জায়গায় এক মাস ঘোরালেন। অর্থাৎ আপনি সময়কে অপচয় করলেন। ওই মানুষটাকে কষ্ট দিলেন।

মনে রাখবেন সময় ব্যবহারের স্বাধীনতা আছে, তাই যা খুশি করাও উচিত হবে না। আপনাকে এই বিষয়টা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। দায়িত্বশীলের কাজের গতি হতে হবে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। এভাবে যদি দৈনিক আপনি এক ঘণ্টা সময় অতিরিক্ত বের করতে পারেন তবে বছরে ৩৬৫ ঘণ্টা বেশি কাজ করতে পারবেন।

"নামাজ পড়, রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই,
তোর আখেরের কাজ করে নে সময় যে আর নাই।"
কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহী কবি

৪. দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করুন :

কোন কাজ কোন সময় করবেন? কোনটা করবেন, কোনটা করবেন না? এ নিয়ে অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন যা মোটেই ঠিক নয়। এ দ্বিধাদ্বন্দ্বে অযথা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। কারো কারো এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পুরো দিনটাই কেটে যায়, কোনো কাজ আর করা হয় না। এটি খুবই নিন্দনীয় স্বভাব। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে নির্বিঘ্নে কাজ করে যেতে হবে। কাজের তালিকা পূর্বের দিন করে রাখলে এ সমস্যায় আর পড়তে হবে না।

৫. কাজের অগ্রাধিকার তালিকা :

নাম উল্লেখ না করে একটা উদাহরণ দিই। ঢাকা শহরে বাৎসরিক একটা মোনাজাতের আয়োজন করা হয় (কভিডের কারণে যা এখন বন্ধ)। আমার পরিচিত অনেকেই সেই লম্বা মোনাজাতে অংশ নেয়। মোনাজাত জোহরের নামাজের কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়। তারপর গাড়িঘোড়া কিছু পায় না। হাঁটা শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যা। এর মধ্যে জোহরের নামাজ, অনেকের আসরের নামাজ মিস হয়ে যায়। আপনি যদি ওই জাতীয় এক হাজার মোনাজাতেও অংশ নেন, তারপরও তার অজুহাতে জোহরের নামাজ ত্যাগ করতে পারেন না।

আপনি ইচ্ছামতো কাজ করতে পারেন। কিন্তু কাজের অগ্রাধিকার দিতে হবে। জোহরের নামাজ নিশ্চিত করার পর এমন ১০০ মোনাজাতেও আপনি অংশ নিতে পারেন। সমস্যা নেই।

তাই কখন কোন কাজ জরুরি তার জন্য অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করুন। তালিকা না থাকলে দেখবেন দিনের শেষে ধরা পড়বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ থেকে গেছে। আর কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়েছে। কাজের অগ্রাধিকার তালিকা করা থাকলে কোনো কাজ যদি বাদ দিতে হয়, তো কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দেয়া সম্ভব হবে। কর্মব্যস্ত দায়িত্বশীলকে এটি দারুণভাবে সহযোগিতা করবে।

৬. সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট সময়সূচি তৈরি করুন :

লিখিত আকারের যেকোনো কাজের অগ্রগতি বাড়ায়। এ কারণে পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যক্রম লিখিত। প্রত্যেকটি ডেটা আলাদা আলাদা করে লিপিবদ্ধ যেমন করা হয় তেমনি পরবর্তী কার্যক্রম আগেই তৈরি করে দেয়া হয়। ভেবে দেখুন এই বিষয়টিও মহান আল্লাহ আপনার জন্য দিয়েছেন। ভেবে দেখুন আপনি এ পৃথিবীতে এসে যখন বুঝতে শেখেন তখন থেকেই পেয়েছেন মহাপবিত্র নির্ভুল গ্রন্থ আল-কোরআন। যা আপনাকে বলে আপনি আপনার চব্বিশ ঘণ্টা কীভাবে কাটাবেন। অর্থাৎ আপনার চলাফেরা, কাজের ধরন, উদ্দেশ্য, ভালো-মন্দ সবই লিখিত আকারে দেয়া হয়েছে। আপনার কাজ সঠিকভাবে তা পালন করা।

৭. একসাথে অনেক কাজ করার চেষ্টা করা :

দায়িত্বশীল মানুষ কোনো কিছুতে পিছিয়ে পড়ে না। তারা হয় কর্মঠ। ঢিলেঢালা কিংবা অকর্মা হয় অলস মানুষ। গ্রামবাংলার এই প্রবাদ মনে রাখুন-

'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডাখানা।'

কাজ না করে অলস সময় কাটানো ইসলামে অপছন্দনীয়। কর্মঠ মানুষ সমাজে যেমন সমাদৃত হয়, তেমনি আল্লাহর কাছেও প্রিয়। যে নিজ হাতে রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ করে, সেই হাতকে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ। অলস মস্তিষ্ককে বলা হয়েছে শয়তানের আখড়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন-

'আল্লাহর কাছে শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে বেশি উত্তম ও প্রিয়। তুমি ওই জিনিসে যত্নবান হও, যার মধ্যে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আর উৎসাহহীন (হিম্মতহারা) হয়ো না।

(মুসলিম, হাদিস : ৪৮২২)

মানুষ যখন নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে, তখনই তার মন পাপ কাজের দিকে ধাবিত হয়। ইহকাল বা পরকালের যেকোনো কাজে অলসতা অবশ্যই নিন্দনীয়। অনেক সময় ভালো কাজ করতে চাইলে শয়তান এসে বাদ সাধে। শয়তানের ধোঁকায় অনেক সময় মানুষ অলসতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। কোনো কাজ করার সময় যখন অলসতা দেখা দেয়, তখন সেই সময়টি মানুষের জন্য পরীক্ষার। মন চাইবে অলসতার কাছে হার মেনে নিতে, কিন্তু সেটা মানা যাবে না। সাহসিকতা ও কর্মঠ মানসিকতার দ্বারা অলসতার মোকাবেলা করতে হবে।

আপনাকে অবশ্যই অনেক কাজ করতে হবে। এক কাজের দোহাই দিয়ে অন্য কাজকে পিছে ফেলে রাখা বা না করা আর যেই হোক দায়িত্বশীল এমন করতে পারে না। কাজেই একসাথে

অনেক কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কিছু সাধারণ কাজ কৌশলে সেরে নিতে পারেন-

ক. গাড়িতে বসে প্রয়োজনীয় ফোন করার কাজটা সেরে নেয়া যেতে পারে।

খ. ক্লাসে স্যার আসতে দেরি হচ্ছে কিংবা আসবেন না, এই সুযোগে প্রয়োজনীয় লেখাটা বা নোটটা লিখে নেয়া যায়।

গ. অন্যান্য অবসরে কাজের তালিকা তৈরি করে নিতে পারেন।

৮. শেষ সময়ের জন্য কাজ ফেলে রাখা :

একেবারে শেষ সময়ে এসে কাজ করতে যাওয়াটা সবচেয়ে বড় বোকামি। কারণ তখন কাজটি করার সুযোগ নাও পাওয়া যেতে পারে। তখন দেখা যাবে অনেকগুলো কাজ একেবারে জরুরি। কিংবা কাজের চাপে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আবার সময় পাওয়া গেলেও তাড়াহুড়ার কারণে নানা ধরনের ভুলভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

তাই তাড়াহুড়ো না করে যেকোনো কাজ ধৈর্যের সাথে করতে হবে। কারণ ধৈর্য হলো একজন শক্তিশালী মনের মানুষের প্রধান গুণ। ধৈর্যই মানুষকে সব বিপদ আর দুরবস্থার মধ্যে আশা করার শক্তি দেয়। যার মধ্যে ধৈর্য নেই, তাকে দিয়ে আসলে কিছুই হয় না। একজন মানুষের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার ক্ষমতা তার সামনে থেকে যেকোনো বাধাকে সরিয়ে দিতে পারে। যেকোনো কঠিন কাজকে সহজ করে দেয় এই একটি মাত্র গুণ।

ধৈর্য ধারণ করো। সহজ হওয়ার আগে সবকিছুই
কঠিন মনে হয়।'

শেখ সাদি (রহ.), সুফি ও দার্শনিক

১৫
সময় ব্যবস্থাপনার কৌশল

এ বইটি সেই সমস্ত মানুষের জন্য যারা জীবনকে উপভোগ করতে জানেন এবং মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করেছেন। আর তাদের জন্য নয় যারা কেবল দর্শক হিসেবে জীবনের সময় অপচয় করে। জীবনের খেলার মাঠে জয় পেতে হলে অবশ্যই আপনাকে টাইম ম্যানেজমেন্ট শিখতে হবে। তাই কৌশলগত দিক দিয়ে নিজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। আসুন কিছু কৌশল সম্পর্কে জেনে নেই-

১ টেলিফোনে উপস্থিতি নিশ্চিত করা :

কারো সাথে দেখা করতে যেতে চাইলে আগে টেলিফোনে কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে তার উপস্থিতি নিশ্চিত করে তবে যেতে হবে। কারণ তাকে না পেলে আপনার সময়টা অপচয় হবে।

২. নোটবুক ব্যবহার করা :

সবসময় কাগজ-কলম বা ছোট নোটবুক সাথে রাখবেন। কোনো কাজের তালিকা মনে হওয়া মাত্রই যেন লিখে নেয়া যায়। তবে এখন বিষয়টা আরো সহজ। যেকোনো স্মার্ট ফোনে নোটবুক থাকে। শুধু নিয়ম করে কাজের তালিকা লিখে নিলেই হলো।

৩. যথেষ্ট সময় হাতে রেখে রওনা হওয়া :

দূরে যেতে হলে পথে জ্যাম কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটতেই পারে। তাই যথেষ্ট সময় নিয়ে রওনা দিন। এতে সময়মতো যেন যথাস্থানে পৌঁছতে পারবেন।

৪. আত্মকেন্দ্রিক লোক এড়িয়ে চলা :

আপনার সময় নষ্ট করতে পারে এমন লোক থেকে দূরে থাকুন। দরকার হলে তালিকা করে অলস এবং সময় নষ্টকারী লোকের তালিকা করে নিন। বিশেষ করে অন্যের কাজে নাক গলানো মানুষ থেকে ১০০ হাত দূরে থাকুন।

৫. মোবাইলে সব কাজ সেরে নেয়া ঠিক নয় :

মোবাইলে সেরে নেয়া যায় এমন কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে না যাওয়াই ভালো। তবে অফিশিয়াল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কোনো বড় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কেবল মোবাইলে কাজটা সেরে

নেয়ার চিন্তা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ মিটিং করে এবং সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। এতে সাময়িকভাবে বেশি সময় রাগলেও অদূর ভবিষ্যতে সময়ক্ষেপণ কম হবে।

৬. সবসময় কাছে কিছু খুচরা টাকা রাখুন :

রাস্তায় চলতে রিকশা ভাড়া, বাস ভাড়া ইত্যাদির জন্য সবসময় কাছে খুচরা টাকা রাখবেন। যেন খুচরা করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট না হয়। এই অভ্যাসের কারণে বাড়তি ঝামেলাও কমবে।

৭. সাক্ষাতের জন্য পূর্বেই সময় নেয়া :

কারো সাথে সাক্ষাৎ করে কথা বলতে চাইলে পূর্বেই সময় নিয়ে নেবেন এবং কত সময় কথা বলবেন তাও জানিয়ে দেবেন।

সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়ায়

আপনি কি মনে করেন আপনি এখন যে পরিমাণ কাজ করছেন তার চেয়ে বেশি কাজ করা আপনার পক্ষে সম্ভব? আপনি কেন তা পারছেন না তা কি উপলব্ধি করতে পারছেন?

আপনার কাজ করার একটা সীমা কিন্তু আছে। তবে আপনার চিন্তা করা বা কৌশল অবলম্বন করার কারণে আপনি চাইলে সীমাকে অতিক্রম করতে পারেন। কিছু নিয়ম যদি আপনি অভ্যাসে পরিণত করেন তাহলে বিষয়টি একেবারে সহজ। এতে প্রত্যেক দিন নিয়মমাফিক আপনি এক দিনে যে পরিমাণ কাজ করতে চাইছেন তার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারবেন।

১. প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে কাজের তালিকা তৈরি করুন : যে কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটাকে ওপরে রেখে ও কম গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে এখনই একটা তালিকা বানিয়ে নিন। প্রাথমিক তালিকা আপনার মোবাইলের প্যাডেও তৈরি করে নিতে পারেন। এটা আপনার সময় বেশি বাঁচাবে। যেই কাজটি শেষ করবেন সাথে সাথে ওটাতে ক্রস চিহ্ন দিন। এভাবে একটা একটা করে কাজগুলো শেষ করুন।

২. কিছু কাজ অন্যকে দিয়ে করান : এই কাজটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেই বলেছি আপনার নিজের কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই সব কাজ নিজে করতে গেলে আপনার ওপর খুব বেশি চাপ পড়ে যাবে। এর ফলে কোনো কাজই ভালোমতো করা সম্ভব হয় না। সুতরাং, কিছু কিছু কাজ অন্যকে দিয়ে করানোর ব্যবস্থা করুন।

৩. সবকিছু ভেবেচিন্তে গুছিয়ে নিন : যেকোনো কাজ গুছিয়ে করলে খুব সহজে ও খুব তাড়াতাড়ি করা যায়। সুতরাং কাজগুলোকে গুছিয়ে করার চেষ্টা করুন।

৪. মাঝে মাঝে না বলুন : আপনি কারো অধীন হয়ে কাজ করলে বা যৌথ কারবারিতে ব্যবসা পরিচালনা করলে আপনার বস বা পার্টনার অনেক সময় অযথা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে। বিশেষ করে কৌশলে আপনার ওপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে। এ সময় খুব সচেতনভাবে ও ভদ্রতার সাথে 'না' বলার চেষ্টা করুন। অন্যথায় অতিরিক্ত কাজ করতে করতেই আপনার দিন শেষ হয়ে যাবে।

৫. অলসতা বন্ধ করুন : অলসতা আপনার সাফল্যকে অবশ্যই ধ্বংস করবে। অলসতা করে কখনো চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়া যায় না। তাই যেকোনো কাজ করার সময় যেটুকু সময়ের মধ্যে পারা যায় তাতেই কাজটি শেষ করার চেষ্টা করুন। অলসতা করে একটি কাজে দেরি করলে অন্য কাজগুলোতে এর জন্য ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

৬. নিয়মমাফিক ঘুমানোর চেষ্টা করুন : হুটহাট না ঘুমিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মমাফিক ঘুমান। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন এবং সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠুন। আর রাতে ভালো ঘুম না হলে কারো পক্ষেই দিনের বেলা ভালোমতো কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এর ফলে দিনের বেলা কোনো কাজই শেষ করা সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং যথাসময়ে ঘুমিয়ে নিজের সময়কে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করুন।

১৭
সময়ের হিসাববিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা

কোরআনে সময়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহতায়ালা একাধিক স্থানে সময়ের হিসাববিজ্ঞান (Accounting) ও জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy)-এ দুই জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন। সময়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহতায়ালা বলেন-

আর তিনি দিবারাত্রিকে পরস্পরে অনুগামী করেছেন। যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায় তার জন্য।

(সুরা আল ফুরকান)

আল্লাহতায়ালা আরো বলেন-

তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন, তারা অনুগত হয়ে নিজ নিজ পথে চলছে। আর তিনি রাত ও দিনকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন।

(সুরা আল ফুরকান)

আল্লাহ আরো বলেন-

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে চলছে।

আল্লাহ আরো বলেন-

নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবস রাত্রির পরিবর্তনের জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নির্দেশাবলি রয়েছে।

আল্লাহ আরো বলেন-

আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি। আল্লাহ আরো বলেন : আল্লাহ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।

আল্লাহ আরো বলেন-

সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাবের অধীনে।

আল্লাহ আরো বলেন-

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলো, এগুলো হচ্ছে জনসমাজের ও হজের সময় নিরূপক...।

আল্লাহ আরো বলেন-

মানুষের ওপর অন্তহীন মহাকালের এমন এক সময় কি এসেছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।

আল্লাহ আরো বলেন-

তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তারই হুকুমে; অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

আল্লাহ আরো বলেন-

শপথ ফজরের, শপথ দশটি রাতের।

আল্লাহ আরো বলেন-

সকালের উজ্জ্বল আলোর শপথ, রাতের শপথ যখন তা হয় শান্ত নিঝুম। মহান আল্লাহ কোনো তুচ্ছ বিষয়কে নিয়ে শপথ করেন না। আর তার সময়কে নিয়ে কসম করাতে সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মহানবী (স.) সময়কে গুরুত্ব দিতে এবং একে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে অনেক তাকিদ দিয়েছেন। এমনকি তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, প্রতিটি মানুষকে সময়ের হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে।

১৮
প্যারেতো নীতি ও ইসলামি প্রসঙ্গ

অল্প কাজে বেশি ফল ভোগ করার নীতিটাকে বলা হয় 'প্যারেতো নীতি' বা 'Pareto’s Principle'. এই নীতির আরেক নাম '80/20 rule'।

১৯০৬ সালে ইতালির অর্থনীতিবিদ ভিলফ্রেদো প্যারেতো একটি সূত্র প্রয়োগ করেন। অর্থ, সম্পত্তি ও যেকোনো সমাজের অগ্রগতির ওপর তিনি এই ৮০/২০ সূত্র ব্যবহার করেন। বুঝতে কঠিন হয়ে গেল। হতে পারে। তবে যেকোনো মোটিভেশনাল বইয়ের মধ্যেই এ নীতি নিয়ে কিছু না কিছু কথা বলা হয়েই থাকে। আমরাও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন যুক্তিতে নাজেহাল।

ভিলফ্রেদো প্যারেতো এটাকে একটি সূচকরূপে ব্যবহার করেন। তিনি তার গবেষণায় খুঁজে পান যে অল্প কিছু ব্যক্তি ও পরিবার-যাদের তিনি 'অভিজাত শ্রেণি' রূপে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তারা সমগ্র ইউরোপের ৮০ শতাংশ সম্পত্তি ও সম্পদ ভোগ করে।

উইকিপিডিয়া প্যারেতো নীতির Definition দিয়েছে এভাবে 'the Pareto’s Principle states that for many events, roughly 80% of the effects come from 20% of the causes.' মানে ২০ ভাগ কারণে ৮০ ভাগ প্রভাবের উদ্ভব। আরো সহজভাবে বললে-

তিনি ৮০/২০ সূত্রটি অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে দেখেন যে তা সমানভাবে কার্যকর। এটা মানুষের যেকোনো প্রচেষ্টা, কাজে বা প্রকল্পে একইভাবে সমর্থনযোগ্য। তার মানে, আপনি যে কাজই করুন না কেন তার এমন ২০ শতাংশ কাজ রয়েছে যা অন্য ৮০ শতাংশ কাজের সমান। ব্যবস্থাপনার জনক পটার ড্রুকার আরো একটু এগিয়ে বলেন, 'আপনার এমন ১০ শতাংশ কাজ আছে যা বাকি ৯০ শতাংশের সমান মূল্যবান।' একে ৯০/১০ সূত্রও বলে।

প্যারেতো নীতি ভদ্রভাবে বিশ্লেষণ করলে একবাক্যে বলা চলে ৮০ ভাগ সম্পদ কুক্ষিগত থাকে ২০ ভাগ লোকের কাছে। ঠিক তেমনি ৮০ ভাগ লোকের কাছে থাকে মাত্র ২০ ভাগ সম্পদ। এই হলো মূল কথা।

এই নীতির ওপর ভর করে বিভিন্ন মোটিভেশন আমরা গোগ্রাসে গিলে খাচ্ছি। ব্যাপারটা কিন্তু অর্থনীতি এবং বিশ্ববাজারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি সহজ করে বলি এভাবে-বিশ্বের ২০% দেশ বাকি ৮০% দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাহলে কি ভুল বলা হবে? এ কথা সত্য, এই নীতিতে ভুল নেই। বিশ্লেষণে ভুল নেই। তবে এর বাস্তবিক পরিবর্তন করতে হলে এই নীতি পুরোপুরি ব্যর্থ। কারণ এইট মুক্তির পথ নয়।

কিন্তু কেন?

কারণ আজো বিশ্বের মোট অর্থ সম্পদের সিংহভাগ গুটিকয়েকের হাতে আর অধিকাংশ মানবজাতি নিঃস্ব প্রায়। ফলে সেই বহুকালের মানব সভ্যতার নির্মম বাস্তবতা-বৈষম্য আর দূরই হলো না। বরং শিল্প আগ্রাসন, রাজনৈতিক আগ্রাসন, বিশ্বে ক্ষমতার অসাম্যতা, যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্মীয় ভ্রান্তিতে আমরা ডুবে আছি।

'ওয়াল স্ট্রিট দখল করো' আন্দোলনের আদলেই বিশ্বের ৮২টি দেশের ৯৫১টি শহরে বিক্ষোভ হয়েছে শনিবার ১৫ অক্টোবর ২০১১। টাইম ম্যাগাজিনের এক খবরে বলা হয়-

What happens in New York, doesn’t stay in New York. As Occupy Wall Street enters its fourth week, its power is resonating throughout Asia and Europe. Other key financial capitals, from Hong Kong to London, are joining the fray.

সারা বিশ্বে এখন মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তি চায়। বৈষম্যের মাত্রা বাড়তে বাড়তে সাধারণ মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তাহলে প্রশ্ন এখানে দুটো-

১. এই বৈষম্য থেকে পরিত্রাণ কিসে?

২. সত্যিই কি পরিত্রাণ আছে?

উত্তর একেবারে সহজ। জি আছে। আর তা হলো ইসলাম। এবং একমাত্র ইসলামিক টাইম ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি।

'এবং তোমরা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য জাকাত আদায় করো। অতঃপর তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন।'

(সুরা আর-রুম, আয়াত : ৩৯)

জাকাত আদায়ের ব্যাপারে বিশ্বনবী হজরত মুহম্মদ (সা.) বলেন-

'নিশ্চয়ই আল্লাহপাক জাকাত দেয়া ফরজ করেছেন যেন তোমাদের অবশিষ্ট সম্পদকে নির্দোষ বা
নির্বিঘ্ন করে দিতে পারেন'।

(আবু দাউদ শরিফ)

উনিশ শতকে মূলত কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম। তবে মূলত বিশ শতকে পশ্চিমা বিশ্বে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজকল্যাণ নীতির উদ্ভব ঘটে। একবিংশ শতকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলতে আর্থসামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপক উন্নয়ন বোঝায়। যে রাষ্ট্র জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা বেশি নিশ্চিত করে তাই কল্যাণ রাষ্ট্র। আর সামাজিক নিরাপত্তা বলতে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের ন্যূনতম অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তাকেই বোঝায়।

বাস্তবতা হলো পুঁজিপতিরা লৌকিকতার খাতিরে কিছু দান করে। তবে তা মহানুভবতা বা সংবেদনশীলতার জন্য নয়। বরং আমাদের অসাম্য উচ্চশ্রেণিকে বৈষয়িক করে, মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ইতর, আর নিম্ন শ্রেণিকে বর্বর করে তোলার জন্য।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত Millennium development Goals-এর অন্যতম প্রধান অঙ্গ দারিদ্র্য বিমোচন। এত কিছুর পরও দারিদ্র্য কমে না বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে, মাত্র কয়টা টাকার জন্য নারী তার সতীত্ব হারাচ্ছে। মা তার সন্তানকে ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে বিক্রি করে দিচ্ছে। ডাস্টবিনের ময়লা পচাবাসি খাবার খাওয়ার জন্য কুকুর-মানুষ একসাথে লড়াই করছে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রতিদিন দারিদ্র্যের কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে। পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষ আজ খাদ্যহীন, আশ্রয়হীন। আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, ইরাক, ভারত, সুদান, কঙ্গো-আরো কত দেশ? কত অঞ্চল।

স্বপ্নের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আয়হীন পরিবার আছে। হয়তো বিশ্বাস হচ্ছে না? কিন্তু এটাই সত্য। সম্পদ আছে কিন্তু বণ্টন সুষম নয়। এটাই এখন তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কারণ দুনিয়ার সম্পদকে তারা মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত করে ফেলেছে। আমরাও সেই ধারাবাহিকতায় মহান আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।

একজন মুসলমান অবশ্যই রুটি-রুজি ও সম্পদ অর্জনে সচেষ্ট হবে। কিন্তু সম্পদের দাস হওয়া যাবে না। বরং সম্পদের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে নিজ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে হবে।

ইসলামি টাইম ম্যানেজমেন্টের রাষ্ট্রীয় মডেলের অন্যতম প্রধান দিক হতে হবে বহুমুখী। যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং মানুষের উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। মানুষ সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করবে, কখনোই সম্পদ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে না।

ইসলাম এমন শিক্ষা দেয়। যেখানে নিচের শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করবে-

১. মানুষের উভয় জীবনে কল্যাণ সাধন করা।
২. আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণ।
৩. মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা।
৪. কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।
৫. আর্থসামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।
৫. আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
৬. সামাজিক নিরাপত্তার শতভাগ নিশ্চয়তা।
৭. জাতীয় নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন-যারা জাকাত দিতে ছলচাতুরীর আশ্রয় নেবে আমি তাদের কাছ থেকে জাকাত এবং সম্পদের অর্ধেক আদায় করব।

ওমর (রা.) বলেন-আমি যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে বিত্তশালীদের অতিরিক্ত সম্পদ গরিব ও মুহাজিরদের মাঝে ভাগ করে দিতাম।

আলী (রা.) বলেন-অভাবগ্রস্তদের অভাব দূরীকরণে বিত্তশালীদের ধন-সম্পদের ওপর অনেক দায়িত্ব বর্তায়। যদি ক্ষুধার্ত ও নাঙ্গা মানুষ থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সম্পদশালীরা তাদের দায়িত্ব পালন করছে না।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন-তোমাদের সম্পত্তিতে জাকাত এবং এর অতিরিক্ত আরো দাবি আছে।

মূলত জাকাত ব্যবস্থার দ্বারা ধনীদের সম্পদে গরিবদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। জাকাত দুস্থ-গরিবদের প্রতি ধনীদের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়, বরং অধিকার।

প্যারেতো নীতি নয়, বরং জাকাত ব্যবস্থাই পারে সম্পদের সুষম বণ্টন করতে। ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর করতে।

১৯
টাইম ম্যানেজমেন্টের কিছু কৌশল

আপনি যখন একটি কর্মদিবস আরম্ভ করবেন তখন আপনার সামনে অনেক কাজই থাকবে। এটা স্বাভাবিক, আপনার কাজের তালিকাটি চট করে দেখে নিন। আপনার কাছে যদি দশটি কাজের তালিকা থাকে তবে সেখানে এমন দুটি কাজ অবশ্যই থাকবে যা অন্য সবগুলোর চেয়ে বেশি মূল্যবান। ওই দুটি আগে শুরু করুন।

কৌশল ১ : চাপ রেখে কাজ করুন

চাপটি অন্যের ওপর নয়, চাপ রাখতে হবে নিজের ওপর। তার মানে এই নয় যে, নিজের মধ্যে অযথা টেনশন বাড়াবে। এই চাপ হলো কাজ করার আগ্রহ তৈরির জন্য নিজের মধ্যে মানসিক শক্তি সঞ্চয়।

কৌশল ২ : কাজের অগ্রিম তালিকাকরণ

'আপনাকে যদি এক মাসের জন্য দেশের বাইরে থাকতে হয় বা অন্য কোনো জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, তবে আগে কোন কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে?'

টাইম ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে 'গৌণ কাজগুলোকে আগে করা'। কারণ মুখ্য কাজগুলো খুঁজে বের করতে মেধা এবং বুদ্ধির প্রয়োগ জরুরি। মনে রাখবেন সাধারণভাবে মুখ্য কাজগুলো একটু কঠিন আর গৌণ কাজগুলো সহজ হয়ে থাকে। আর এটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে সবাই সহজ কাজগুলো দিয়ে আরম্ভ করতে চায়। নিজের আরামদায়ক গণ্ডি ছাড়তে চায় না। এটা নিয়ে অস্বস্তিবোধ করার কোনো কারণ নেই। এটা সবার মধ্যেই আছে। আপনারও আছে আমারও আছে।

আপনাকে অস্বস্তিবোধ করতে নিষেধ করেছি, তাই বলে পরিবর্তন করতে, উন্নত হতে ও জীবনে এগিয়ে যেতে মানা করছি না। জীবনে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি আপনার মধ্যে শক্তি আছে, সাহস আছে। সেই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগান।

কৌশল ৩ : গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগে রাখুন

আপনার হাতে হয়তো অনেক কাজ রয়েছে। সব কাজই একসময় না একসময় করতে হবে। তাই বলে একসাথে সব কাজে হাত দেবেন না। কাজগুলোর গুরুত্ব অনুযায়ী কিছু কাজ আগে সম্পন্ন করবেন আর কিছু পরে। কোন কাজের গুরুত্ব বেশি তা আগেই নির্ধারণ করুন এবং প্রথম কাজ প্রথমে করুন।

কৌশল ৪ : সাফল্যের তিন তত্ত্ব

ব্রায়ান ট্রেসির মতে, আপনার এক সপ্তাহ বা এক মাসের যে কাজ তার নব্বই শতাংশ কাজ থাকে মূলত তিনটি কাজের মধ্যে। এই তিনটি কাজে সাফল্যই আপনাকে আপনার ব্যবসায় ৯০ শতাংশ কাজ সম্পাদন করে দেবে। এ ক্ষেত্রে তিনি তিনটি জাদুকরী প্রশ্ন রেখেছেন-

১. আপনার কাজের তালিকা থেকে সারাদিনে কেবল একটি কাজ করতে হয় তবে কোন কাজটি আপনি করবেন? একটি গোল বৃত্ত দিয়ে কাজটিকে চিহ্নিত করুন।
২. তালিকা থেকে যদি সারাদিনে দুটি কাজ করতে হয় তবে দ্বিতীয় কাজ কোনটি হবে? দ্বিতীয় কোন কাজ আমার ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি অবদান রাখবে? সাধারণত এটাও খুব সহজেই আপনার চোখে পড়বে। হয়তো চিন্তা করার জন্য একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু যখন খুঁজে পাবেন তখন এটা দেখবেন স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।
৩. যদি তালিকা থেকে সারাদিনে তিনটি কাজ করতে হয় তবে তৃতীয় কাজ কোনটি হবে? যে কাজটি আমার ব্যবসায়িক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করতে সহায়তা করবে? যখন আপনি আপনার উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করবেন তখন এমন তিনটি কাজ দেখবেন। যেগুলো আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক এই কাজত্রয় করা ও সম্পন্ন করাটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ রাখবেন-যদি আপনি এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর না জানেন, তবে আপনি খুব বড় সমস্যায় পড়বেন। আপনার সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি হবে সেটা হচ্ছে আপনার মূল্যবান সময়ের অপচয়। আপনি কাজ করবেন, কিন্তু প্রায়ই দেখা যাবে আপনি এমন কাজ করছেন যার প্রতিফল খুবই নিম্নমানের বা ফলাফল নেই বললেই চলে।

কৌশল ৫ : গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরি

আপনার কাজগুলোকে দুদিক থেকে বিচার করুন। অল্প কিছু কাজ আছে যা গুরুত্বপূর্ণ আর অনেক তুচ্ছ কাজ আছে যেগুলো করা জরুরি। আপনি যখন আপনার কাজগুলোকে বণ্টন করবেন তখন প্রাধান্য বজায় রাখা দরকার। এবার চার ভাগে ভাগ করতে পারেন-

১. বেশি গুরুত্বপূর্ণ / বেশি জরুরি
২. বেশি গুরুত্বপূর্ণ / কম জরুরি
৩. কম গুরুত্বপূর্ণ / বেশি জরুরি
৪. কম গুরুত্বপূর্ণ / কম জরুরি

আপনার তালিকা করলেন। তবে সমস্যা হচ্ছে এই কাজগুলো চিনবেন কী করে? সর্বপ্রথম ভাবুন কোন কাজগুলোর প্রভাব আপনার পেশাগত জীবনে দীর্ঘমেয়াদে বজায় থাকবে। আর জরুরি কাজ হচ্ছে যেটা আপনি সরিয়ে রাখতে পারেন।

এবার 'এখনই করতে হবে' এমন কাজ খুঁজে বের করুন। এগুলো প্রথমে করুন।

আপনি যখন 'তিনটি কাজ' সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন এবং এর সুফল ভোগ করবেন তখন আপনি যদি অন্যদের সাথেও এটা বিনিময় করেন তবে আরো উত্তম ফলাফল পাবেন। কাজ আরম্ভ করার আগে, একটু সময় নিন, ধৈর্য ধরে ধীরে ধীরে চিন্তা করুন। আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি খুঁজে বের করুন। তারপর সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল সেই কাজটিই করুন।

আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ বিভিন্ন কাজের লিস্ট দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাদের ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে সবচেয়ে বড় ধারণা হলো সঠিক কাজ খুঁজে বের করলেই আমরা সফল হব। কিন্তু তারও আগে জরুরি হলো সঠিক কাজের লিস্ট তৈরি করা। কারণ এই পৃথিবীতে আমাদের প্রতিটি

কাজের অনন্য হিসেব হবে। হিসেব হবে সময় ব্যবহার ও অপচয়ের। মহাপবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

'আল্লাহ পৃথিবীকে আপনার জন্য বিস্তৃত করেছেন, যাতে আপনি তার ওপর প্রশস্ত পথে হাঁটতে পারেন।'

(সুরা নূহ, আয়াত : ১৯-২০)

আমরা আল্লাহর জন্য কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানাই। কিন্তু আল্লাহর বাণীর মধ্যে আমরা কীভাবে তার সেবা করি তা এখনো মহাবিশ্বের মতোই বিচিত্র হতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে তাই মহানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার যেমন গুরুত্ব দেয়া জরুরি, তেমনি তা নির্দেশ মোতাবেক কাজ করার সামর্থ্য পাওয়ার জন্য সাহায্য চাওয়াও জরুরি। কারণ আধ্যাত্মিক সামর্থ্য ছাড়া শারীরিক সকল সামর্থ্য অর্থহীন।

ভুলেও নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করবেন না, কারণ প্রতিটি ব্যক্তি তার আত্মার মধ্যে একটি অনন্য ঐশ্বরিক দয়া ধারণ করে। এটা জানুন, মন থেকে মানুন, আমাদের পৃথিবীতে পাঠানোর আগে আল্লাহ আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কাজ নির্ধারণ করেছেন। আমাদের কেবল তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে হৃদয়ের গহীন থেকে। আপনার পরীক্ষা এবং বিজয়, আপনার উত্থান কিংবা পতন সবই মহানের আশীর্বাদের ফল।

'এই জায়গা যেখানে আপনি এই মুহূর্তে আছেন, আল্লাহ আপনার জন্য একটি মানচিত্রে প্রদক্ষিণ করেছিলেন।'

হাফিজ, ১৪তম শতাব্দীর পার্সিয়ান কবি

যতক্ষণ আপনার হৃৎস্পন্দন চলছে ততক্ষণ আপনার একটি উদ্দেশ্য আছে। সময়ের সঠিক ব্যবহার করাই আপনার সবচেয়ে বড় কাজ। আপনার জন্য মহান আল্লাহর পরীক্ষা, সবই তার ভালোবাসা, তার ইচ্ছা।

এই পৃথিবীকে আপনার দরকার। তাই আপনি গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব আল্লাহ আপনাকে উপহার দিয়েছেন। তাই অলসতা করে সময় কাটালে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ হবে না। কেবল কাজের মাধ্যমেই সঠিক টাইম ম্যানেজমেন্ট সম্ভব। তবে আপনি সফল। মনে রাখবেন কোনো কিছুই নিরর্থক নয়।

'আর আমরা আসমানসমূহ, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যকার কোনো কিছুই খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।'

(সুরা আদ-দুখান, আয়াত : ৩৮)

কৌশল ৬ : রুটি পদ্ধতি

এই পদ্ধতিটা ব্রায়ান ট্রেসির। তিনি বলেছেন, একটি রুটি আপনি কীভাবে খান? একটু একটু করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খান। ঠিক তেমনি একটি বড় প্রকল্পকে টুকরা করুন। যতটুকু কাজ একবারে করা সম্ভব তা হাতে নিন। সেই কাজটুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কিছুতে হাত দেবেন না। এভাবে ভাগ ভাগ করে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করুন। এক সময়ে কেবল একটি কাজ। অন্য যেকোনো কাজ তখন এড়িয়ে চলুন।

আপনি যখনই আপনার মুখ্য প্রকল্পটি নিয়ে বসবেন তখনই দেখবেন নানান কাজের চাপ, দায়িত্বের চাপ অনুভব করছেন। কিন্তু যদি আপনি এক সময়ে কেবল একটি কাজ করেন তবে আপনি অনেক স্বস্তি অনুভব করবেন। এতে করে এক অংশ সম্পন্ন হওয়ার সুখানুভূতি আপনাকে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং আরো কাজ করার শক্তি ও সাহস দেবে। তখন কাজগুলো করা সহজ হয়ে যাবে।

কৌশল ৭ : নিজের মধ্যে ব্যস্ত ভাব ফুটিয়ে তুলুন

আজকের বিশ্ব কর্মময় বিশ্ব। এখানে একটি বিরল গুণ হলো নিজের মধ্যে জরুরি একটি ভাব ফুটিয়ে তোলা। ব্রায়ান ট্রেসি বলেন, দেখা গেছে মাত্র ২ শতাংশ লোকজন কাজ সম্পন্ন করার মতো জরুরি একটি ভাব তৈরি করেন। তারা দ্রুত চলেন। যখন আপনি 'কাজ নির্ভরশীল' হয়ে উঠবেন তখন দেখবেন আপনি আপনার পেশাগত দৌড়ে প্রথম দিকে আছেন।

৩০০ জন উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকের ওপর জরিপ চালানো হয়েছিল। তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তারা তাদের কর্মচারীদের মধ্যে কোন গুণটি সবচেয়ে বেশি চান। ৮৫ শতাংশ একই ধরনের উত্তর দেয়।

১. প্রাধান্য বজায় রাখার সামর্থ্য।

২. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আরম্ভ করা এবং দ্রুত ও ভালোভাবে কাজটি শেষ করা।

যখন আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আবদ্ধ করতে ও দ্রুত সম্পন্ন করতে পারবেন তখন আপনি দেখবেন যে আপনার সামনে সুযোগ ও সম্ভাবনার শতদুয়ার খুলে গেছে।

কৌশল ৮ : গড়িমসি করবেন না

'গড়িমসি করার অভ্যাস হচ্ছে সময় চুরি'। এই কথা শুনে এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, আসলে 'দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে জীবনচোর'।

আপনাকে গড়িমসি করার ভাব অতিক্রম করতে হবে, কালক্ষেপণ করার অভ্যাস দূর করতে হবে। এই দীর্ঘসূত্রতা অতিক্রম করে সময়মতো আপনাকে আপনার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এটাই আপনার পেশাগত জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ধারণ করে দেবে।

যদিও এই দীর্ঘসূত্রতার অভ্যাসটি সবার মধ্যেই বিদ্যমান। দেখা যায়, প্রত্যেকেরই কাজ অনেক কিন্তু সময় খুব কম। তাই বলে যে এটাকে দূর করা যায় না তা নয়। আর যদি সবার মধ্যেই গড়িমসির ভাব থাকত তবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন লোকজনের মধ্যে তফাৎটা কোথায়?

সহজ কথা, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বা কর্মদক্ষ লোকজন নিম্নমানের কাজ করতে গড়িমসি করে। আর নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন লোকজন তার নিজের জন্য ও কোম্পানির জন্য যেসব কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ বা বিবেচনাযোগ্য সেগুলো করতে গড়িমসি করে। আপনি যদি আপনার কর্মদক্ষতা সর্বোচ্চ পরিমাণে বৃদ্ধি করতে চান তবে আজকে থেকেই আপনাকে 'সৃজনশীল দীর্ঘসূত্রতা' মেনে চলতে হবে।

পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করা বৈধ। দায়িত্বশীল ও কর্মক্ষমদের কাজে উৎসাহিত করেছে ইসলাম। আল্লাহতায়ালা বলেন-

'সর্বোত্তম কর্মী সেই ব্যক্তি, যে শক্তিমান ও দায়িত্বশীল।'

(সুরা কাসাস, আয়াত : ২৬)

কোনো প্রতিষ্ঠানে মাসিক বেতনের বিনিময়ে চাকরিতে যোগদানের মানে সে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে মেধা ও শ্রম দিতে আপনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

'হে ইমানদাররা, তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলো পূর্ণ করো।'

(সুরা মায়িদা, আয়াত : ০১)

মনে রাখবেন-দায়িত্বশীলতা বড় আমানত, তাই দায়িত্ব নেয়ার পর গড়িমসি করার কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম আপনাকে সেই সুযোগ দেয় না। বরং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য। আমানত রক্ষায় ইসলাম বলে-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতগুলো প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন মানুষের বিচার-মীমাংসা করবে, তখন ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করো। আল্লাহ তোমাদের সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।'

(সুরা নিসা, আয়াত : ৫৮)

পূর্ণাঙ্গভাবে আমানত আদায় না করা বা গড়িমসি করা মারাত্মক গুনাহ। নবী (সা.) এটাকে মুনাফিক বা বিশ্বাসঘাতকের আলামত বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে মহানবী (সা.) বলেন-

'মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। তা হলো মিথ্যা কথা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং আমানতের খেয়ানত করা।'

(বুখারি, হাদিস : ৩৩)

২০

আপন পথে থাকুন

'নরম-কোমল কথামালা পাথরের চাইতে কঠিন হৃদয়কেও কোমল করে দেয়, কর্কশ-কঠিন কথাবার্তা রেশমের চাইতে কোমল হৃদয়কেও কঠিন করে দেয়।'

সুফি, দার্শনিক ইমাম গাজ্জালি

এই মুহূর্তে আমি আমার সময়ের সবচেয়ে ভালো ব্যবহার কীভাবে করতে পারি?

ঠিক এ প্রশ্নটাই সময় ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নিজেকে বারবার জিজ্ঞেস করুন। এটাকে একটি অভ্যাসে পরিণত করুন।

আচ্ছা আপনার কি কখনো মনে হয়েছে ইসলাম আপনাকে ধনী হতে বারণ করে?

আপনার এমন মনে হলে অবশ্যই আপনি ভুলের মধ্যে আছেন। কারণ ইসলাম আপনাকে ধনী হতে বাধা দেয় না। তবে ধনী হবার যেসব শর্ত বা নিয়মকানুন আছে তা অবশ্যই আপনাকে মানতে হবে। আপনাকে দান করতে হবে, জাকাত অবশ্যই দিতে হবে।

এই যে আমরা এত এত আত্মউন্নয়ন বই পড়ে থাকি এর উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই। সবাই সফল হতে চায়, ধনী হতে চায়। যদিও ধনীর সংজ্ঞা একেকজনের কাছে একেরকম। কেউ উদারতায় ধনী হতে চায়, কেউ জ্ঞানের দিক দিয়ে ধনী হতে চায়, কেউ টাকা-পয়সা-গাড়ি-বাড়ি দিয়ে ধনী হতে চায়। আসুন ইসলামে এই ধনী হবার পদ্ধতিটা কী? যদিও সাধারণভাবে আমরা ধনী হওয়ার বা সফলতা না পাওয়ার কিছু সাধারণ কারণ খুঁজে পাই। কী সেসব কারণ? আগে সেসব কারণ দেখে নেয়া যাক-

বুদ্ধিহীন গাধার খাটুনি

'পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি' এই ভাবসম্প্রসারণের সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। স্কুলে আমরা এমনটাই শিখেছি। যে যত পরিশ্রম করে জীবনে সে তত এগিয়ে যায়।

স্কুল জীবনের এই উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ভাবার কোনো কারণই নেই। বরং বাস্তব জীবনে শুধু বেশি বেশি পরিশ্রম করলেই ধনী হওয়া যায় না। অর্থাৎ গায়ে খাটলেই ধনী হওয়া যায় না। ভেবে দেখুন একটা অফিসের পিয়ন বসের চেয়ে বেশি কাজ করে। একজন দিনমজুর কিংবা একজন রিকশাওয়ালার পরিশ্রমও কম নয়। যদি গাধার খাটুনি খাটলেই ধনী হওয়া যেত তাহলে তারাই সবচেয়ে দ্রুত ধনী হতো।

মূলত ধনী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করার পাশাপাশি আপনাকে জানতে হবে, কীভাবে কাজ করলে সময়ের সঠিক ব্যবহার হবে? যে পরিশ্রম করা হয়েছে তার ফলাফল কীভাবে শতভাগ আসবে। এ ক্ষেত্রে পরিশ্রম করার সাথে সাথে বুদ্ধিকেও কাজে লাগাতে হবে।

জায়গা বুঝে টাকা বিনিয়োগ করাও স্মার্ট কাজের উদাহরণ। ধরুন আপনি গাড়ি চালাতে পারেন না কিন্তু গাড়ি কিনে বসে আছেন। কোনো কাজে লাগবে না। অনেক মানুষের সারাজীবন

যায় পণ্ডশ্রমে। আর তার বুদ্ধির ব্যবহার না থাকার ফলে ফলাফল আসে না। সে ভাগ্যের দোষ দেয়। ঈশপের গল্পটা আরো একবার পড়া যাক-

সিংহ, ভল্লুক এবং চালাক শেয়াল

সিংহ ও ভল্লুক একই সময়ে একটা বাছুর দেখতে পেল। ভল্লুক বলল, 'আমি এটাকে আগে দেখেছি, সুতরাং এইটা আমার।'

সিংহ বলল, 'না, আমি আগে দেখেছি তাই এটা আমার।'

দুজনে মিলে শুরু করে দিল মারামারি।

দূর থেকে চুপ করে ওদের এই মারামারি দেখছিল একটা শেয়াল। মারামারি করে যখন সিংহ ও ভল্লুক দুজনই নিস্তেজ হয়ে পড়ল, তখন শেয়াল বাছুরটা নিয়ে দৌড় দিল। ভল্লুক আর সিংহ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ওদের গায়ে তখন আর কোনো শক্তি ছিল না।

দুঃখ করে তারা বলল, 'কত বোকা আমরা। নিজেরা মারামারি না করে যদি আমরা ভাগাভাগি করে খেতাম, তাহলে আজ শেয়ালের কপালে জুটত না বাছুরখানা।'

উপদেশ : *সব পরিশ্রম শেষ করে ফেললেই সবসময় মুনাফা পাওয়া যায় না।*

সঞ্চয় পদ্ধতি

ধনীরা আগে সঞ্চয় করে, সঞ্চয় করার পর বাকিটা খরচ করে। আর গরিবরা আগে খরচ করে, খরচ করার পর যদি কিছু থাকে তবেই তা সঞ্চয় করে বা করতে চায়। এ কারণে গরিব জানে না কত টাকা সে খরচ করবে। কোনো পূর্ব পরিকল্পনা নেই। এ কারণে তারা মূলত দিন আনে দিন খায়। আর দিন শেষে কোনো হিসাবই মেলাতে পারে না।

ধনী হওয়ার ভাগ্য

বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করে যে, ভাগ্যে না থাকলে ধনী হওয়া যায় না। এটা একেবারেই সাধারণ একটা ধারণা মাত্র। তাই নিজেকে আগে প্রশ্ন করুন, 'কেন আপনি ধনী হতে পারবেন না?' বিশ্বাসকে একটু পাশ কাটিয়ে যান। আর বড় বড় চিন্তা করা শুরু করুন। ধনী ব্যক্তিরা সবসময় বড় লক্ষ্যে পৌঁছতে চান আর সেই অনুসারে চিন্তাগুলোকে আবর্তিত করেন।

আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি

অনেকেই টাকা আয় করে কিন্তু ধরে রাখতে পারে না। তাদের আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করার অভ্যাস। আর এমন অভ্যাস থাকলে আপনি কখনোই ধনী হতে পারবেন না। এমনকি আয় দিন দিন যত বাড়বে, আপনার ব্যয়ও বাড়তে থাকবে। এ ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান ব্যয়বহুল করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। যতক্ষণ না আপনার ইনকাম নিরাপদ এবং নিশ্চিত লাভের অবস্থানে না এসেছে ততক্ষণ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বারবার ভাবুন।

ঘণ্টা হিসেবে পারিশ্রমিক নিন

ধনী আর গরিবের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। গরিব বা মধ্যবিত্ত ঘণ্টা হিসেবে অথবা মাস হিসেবে পারিশ্রমিক চায়। কিন্তু ভেবে দেখুন ধনীরা পারিশ্রমিক অথবা লাভ চায় কাজের ওপর, যত কাজ করতে পারবে তত টাকা দিতে হবে, এরকম শর্তে।

ধনীরা সবসময়ই স্বাধীনচেতা, তাই তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়। আর আপনি ধনী তখনই হতে পারবেন যখন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন। যদিও অধিকাংশ গরিব বা মধ্যবিত্ত একটা নিশ্চিন্ত জীবনের জন্য নিয়মিত বেতনের একটা চাকরি আর প্রতি বছর বেতনের সঙ্গে কিছু টাকা যেন বেশি যোগ হয়, সেই আশায় বসে থাকে। এটা একটি কোনোরকমে বেঁচে থাকার চক্র। এর থেকে বেরোনো কঠিন।

সঞ্চয় করার চেয়ে বিনিয়োগ করুন

সঞ্চয় করা ভালো। কিন্তু টাকা জমিয়ে না রেখে কীভাবে উপার্জন বাড়ানো যায় সেদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। যদিও ধনী হওয়ার জন্য সঞ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সঞ্চয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে গিয়ে অর্থ বিনিয়োগ করাকে অবহেলা করা যাবে না। সাধারণত মিলিয়নিয়াররা একসঙ্গে অনেক জায়গায় বিনিয়োগ করে অর্থ উপার্জন করে। তারা বিভিন্ন আয়ের পথ খুঁজে বের করে। এতে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

বিনিয়োগে আগ্রহ নেই

একটা সহজ কথা মনে রাখবেন। আপনি যদি অলস সময় জীবনের সঙ্গী করে নেন তবে কখনোই ধনী হতে পারবেন না। তাই বেশি উপার্জনের একটা সহজ উপায় হলো, অতিরিক্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করুন, এটাই আপনার সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ যত তাড়াতাড়ি শুরু করবেন ততই ভালো।

একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, 'ধনীরা প্রতি বছর তাদের নিজস্ব আয়ের ২০ শতাংশ বিনিয়োগ করে।'

আপনি বলতে পারেন আমার তো বিনিয়োগের যথেষ্ট জ্ঞান নেই। এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসুন। বিনিয়োগকারী হওয়ার জন্য আপনাকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কলাকৌশল না জানলেও চলবে। ব্যাংক, শেয়ারবাজার, সঞ্চয়পত্রসহ অনেক ছোট ছোট স্কিমে বিনিয়োগ করে দেখতে পারেন। একসময় দেখবেন এই ছোট ছোট বিনিয়োগগুলো কত বড় আকার ধারণ করেছে।

হিসাব করতে পছন্দ না করা

আজই খাতা-কলম ও ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে পড়ুন। কারণ আপনি যদি সত্যিকার ধনী হতে চান, তবে আপনাকে অবশ্যই হিসেবী হতে হবে। এখানে হিসেবী হওয়া মানে শুধু হিসাব করে টাকা খরচ করার কথা বলছি না।

আপনাকে প্রতিটি টাকা কোথায় যাচ্ছে এবং কোন খাতে কত টাকা খরচ হচ্ছে, কত টাকা আয় হচ্ছে, কোন খাতে ব্যয় করাটা লাভজনক হবে, এসব বিষয় খুব ভালো করে হিসাব করতে হবে।

অনেকেই আছে, হিসাব করতে পছন্দ করে না। আপনি হয়তো এমন অনেক বড়লোক দেখেছেন, যারা অনেক টাকা থাকার পরও খরচ করার আগে অনেক ভাবে, অনেক কিছু হিসাব করে তারপর খরচ করে। কারণ ধনী হওয়ার আগে থেকেই তাদের মাঝে এই অভ্যাসটি ছিল। অনেকে এটা পছন্দ না করলেও, আসলে তাদের ধনী হওয়ার পেছনে এই অভ্যাসটির অনেক বড় অবদান।

আবার অনেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ধনী হলেও তা ধরে রাখতে পারে না শুধুমাত্র বেহিসেবী বলেই।

নিজস্ব স্বপ্ন দেখুন

মানুষ আত্মহত্যা করে কখন?

যখন তার নিজস্ব কোনো স্বপ্ন না থাকে তখনই এমন ভয়ংকর পথ বেছে নেয়। স্বপ্নের ক্ষেত্রেও তাই। আপনি যদি সফল হতে চান তাহলে আগে নিজেকে ভালোবাসতে হবে। নিজেকে ভালোবাসলে নিজের কাজকেও ভালোবাসবেন। যদিও অধিকাংশ মানুষ অন্যের স্বপ্নের জন্য কাজ করে। জীবনের স্বপ্নই থাকে চাকরি করবে, একটা ছকবাঁধা জীবনই যেন একমাত্র কাম্য। এটাই গরিব বা মধ্যবিত্তদের বড় ধরনের ভুল। নিজের পছন্দের পেশায় এসেও যখন অন্যের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে হয় তখন বিতৃষ্ণা ছাড়া কপালে আর কিছুই জুটবে না।

দ্রুত আপনার অভ্যাসসহ স্বপ্ন পরিবর্তন করুন। নইলে এভাবেই কেটে যাবে দিন, স্বপ্নেরা ধরা দেবে না।

কাজ শুরু করে শেষ না করা

অনেকে দারুণ সব উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করে। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তার ইচ্ছেশক্তি মরে যায়। কাজটা ফেলে রাখে। এমন অভ্যাসের কারণে অনেকেই ক্যারিয়ারে সফল হতে পারে না। এটা বেশি করে নিম্ন আয়ের মানুষ। তারা আজ এক ব্যবসা আবার কাল আরেক ব্যবসা করে। আর এ কারণে কোনো কাজেই মন দিতে পারে না। ফলে তারা বারবার হোঁচট খায়। এই ধরনের মানুষ অল্পতেই হতাশ হয়ে যায়। আর এ কারণেই তারা নানামুখী ব্যবসা করতে চায়, কিন্তু কোনো কাজই শেষ করে না।

আরামকে বলুন বিদায়

আপনি যদি ধনী হতে চান তবে পরিশ্রম করতে হবে। তাই অযাচিত আরামকে না বলুন। বিশেষ করে ধনী ব্যক্তিরা অনিশ্চয়তার মধ্যেই সুখ খুঁজে নেন। বুদ্ধিমান মানুষরা জানে, ধনী হওয়া সহজ নয় এবং আরামপ্রিয়তা সকল উন্নতির পথকে ধ্বংস করে দিতে পারে। মধ্যবিত্তদের জীবনের সবকিছুর পেছনেই এই উদ্দেশ্যগুলো কাজ করে, বিশেষ করে শারীরিক ও মানসিক সুখ।

আসলে ধনীরা জানে কীভাবে ভয়কে অতিক্রম করে ঝুঁকির জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। আর এটাই তাদের সাফল্যের মূল রহস্য।

শৃঙ্খলার অভাব

বাপের টাকায় ধনী নয়। বরং যদি নিজের চেষ্টায় ধনী হতে চান, তবে আপনাকে কষ্ট করতেই হবে। আর সেই সঙ্গে নিজেকে কঠোর শৃঙ্খলার মাঝে আটকে ফেলতে হবে। রাতারাতি বড়লোক বলতে পৃথিবীতে কিছু নেই।

কত টাকা হলে নিজেকে ধনী মনে করবেন

নিজেকে ধনী হিসেবে কখন ভাববেন? কত টাকা বা কতটা সম্পত্তি হলে তা আপনার মনকে 'হ্যাঁ' বলবে। পরিকল্পনামাফিক কাজ করলে ধনী হওয়া একটা উপভোগ্য ব্যাপার হবে। কোনো পরিকল্পনা করার আগে আপনাকে আপনার ইচ্ছাকে স্থির করতে হবে, আপনি আসলে কত টাকার মালিক হতে চান তা স্থির করতে হবে। আপনার মনে যা যা ইচ্ছা আছে সেগুলো লিখে ফেলুন, যেমন-আপনি একটা বাড়ি কিনতে চান, বিদেশে থাকতে চান, মাসে একবার বিদেশে ঘুরতে চান, জাঁকজমক অবসর কাটাতে চান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মূলত ধনী হতে হলে সাহস, জ্ঞান এবং অনেক চেষ্টা দরকার। তবে সবকিছুই সম্ভব যদি আপনার লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট ছকে ফেলতে পারেন। ধনী ব্যক্তিরা সম্পদ অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু গরিব বা মধ্যবিত্তের অধিকাংশই জানে না তারা কী চায়!

ইসলাম ধনী হওয়ার বিষয়ে কী বলে

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে রাসুল (সা.) এমন কিছু আমল বা উপায়ের কথা উল্লেখ করেছেন; যেসব উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে ধনী হওয়া সম্ভব। দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তিলাভ করে সচ্ছলতা অর্জন করা সম্ভব এসব উপায়ের মাধ্যমে।

যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করে, আল্লাহতায়ালা তাকে ধনী করে দেন-

১. সবসময় অজু অবস্থায় থাকা।

২. আল্লাহর রাস্তায় দান।

৩. হজ করা।

ধনী হওয়ার আমলগুলো নিয়মিত করার মাধ্যমে একজন অভাবী, দুঃখী সচ্ছল ও সুখী মানুষে পরিণত হতে পারবে। ধনী হওয়ার জন্য ইসলামি জীবনযাপন করতে হবে। চলুন দেখে নিই ধনী হতে গেলে কী কী আমল করতে হবে।

এর জন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে নিচের দোয়াসমূহ আমল করতে হবে।

আমল ০১

নবী করিম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া দৈনিক এক হাজারবার পাঠ করবে, আল্লাহ চাহে তো সে অল্পদিনেই ধনী হয়ে যেতে পারে। জুমার নামাজের পর যদি ৭০ বার পাঠ করে, তবে আল্লাহ চাহে তো তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।

'আল্লাহুম্মাকফিনি বি-হালালিকা আন-হারামিকা ওয়াআগনিনী বি-ফাদলিকা আম্মান সিওয়াক।'

(মিরকাত)

আমল ০২

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, একসময় জনৈক ব্যক্তি হুজুর আকরাম (সা.)-এর খেদমতে এসে বলল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! দুনিয়া আমাকে পরিত্যাগ করেছে এবং আমি অভাবগ্রস্ত ও অক্ষম হয়ে পড়েছি। আমার পরিত্রাণের কোনো উপায় আছে কি?

হুজুর (সা.) দোয়া শিখিয়ে দিলেন। বললেন-

'সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবাহানাল্লাহিল আজিমি ওয়া বিহামদিহি আসতাগফিরুল্লাহ।'

অর্থ : আল্লাহতায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসা গীতির সাথে তাকে স্মরণ করছি, মহান আল্লাহতায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসা বর্ণনার সাথে আল্লাহতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আমল ০৩

এটি হলো বিবাহ। কারণ বিবাহ ধনী হওয়ার একটা সহজ উপায়। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন যে, বিবাহ করলে তিনি নিজ অনুগ্রহে তাকে ধনী করে দেবেন।

'যদি তারা অভাবগ্রস্ত থাকে আল্লাহতায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনী করে দেবেন। আর আল্লাহতায়ালা প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।'

(সুরা নূর : ৩২)

রাসুল (সা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহতায়ালার জন্য কর্তব্য হয়ে যায়।

১. *আল্লাহতায়ালার রাস্তায় জিহাদকারী।*

২. *চুক্তিবদ্ধ গোলাম যে তার মনিবকে চুক্তি অনুযায়ী সম্পদ আদায় করে মুক্ত হতে চায়।*

৩. *ওই বিবাহিত ব্যক্তি যে (বিবাহ করার মাধ্যমে) পবিত্র থাকতে চায়।*

(তিরমিজি-১৬৫৫, নাসায়ী-৩২১৮, ৩১২০)

তাহলে প্রশ্ন এটাই যে, সব মানুষ কি ধনী হতে পারবে? উত্তরটা হলো- না। কারণ কিছু মানুষ সম্পদ পেয়ে উদ্ধত হয়ে যায়, অহংকারী হয়ে ওঠে। তাই সব মানুষকে ধনী বানানো হয়নি বা সব মানুষকে ধনী বানানো হবে না, যাতে একে অন্যের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। অর্থাৎ যাতে মানুষ বিভিন্ন পেশা ধারণ করে একে অন্যের সহযোগিতা করতে পারে।

'তারা কি তোমার রবের করুণা বণ্টন করে? আমিই (আল্লাহ) তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অন্যজনের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করি, যাতে একে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে...। '

(সুরা : জুখরুফ, আয়াত : ৩২)

এ কারণে সব মানুষকে অঢেল সম্পত্তি দেয়া হয়নি, যাতে মানুষ উদ্ধত হতে না পারে।

'আল্লাহ তার সব বান্দাকে জীবন উপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি (আল্লাহ) তার ইচ্ছামতো যথাযথ পরিমাণে রিজিক অবতীর্ণ করেন। তিনি তার বান্দাদের সম্যক জানেন ও দেখেন।'

(সুরা : শুরা, আয়াত : ২৭)

মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে ধনী বানিয়েছেন। আবার কিছু মানুষকে গরিব বানিয়েছেন। রিজিকের এই হ্রাস-বৃদ্ধি পরীক্ষাস্বরূপ। ধনীর জন্য আল্লাহর নির্দেশ পালন ও মানুষের অধিকার আদায়ের পরীক্ষা আর গরিবের জন্য থাকে ধৈর্যের পরীক্ষা। কেননা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বেশি। তাই সব মানুষকে ধনী বানানো হলে গোটা সমাজ পাপাচারে ভরে যেত।

যাদের ধনী বানানো হয়নি, তাদের জন্য সান্ত্বনা হলো, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে তাদের পরকালীন জীবন সমৃদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন।

আপনি যেখানে যেভাবেই থাকুন না কেন আপনি পজিটিভ ভাবুন। মহান আল্লাহর দেখানো পথে নিজেকে আত্মসমর্পণ করুন। শুধু অর্থ সম্পত্তি থাকলেই মানুষ ধনী হয় না। মানুষ ধনী হয় আল্লাহর দেখানো পথে সঠিক টাইম ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে।

এজন্যই নিজেকে সর্বদা জিজ্ঞেস করবেন, 'এই মুহূর্তে আমার সময়ের সবচেয়ে ভালো ব্যবহার কীভাবে করতে পারি?' তারপর আপনি নিজেকে দিয়ে সেই কাজটি করিয়ে নেবেন।

আপনার মানসিকতা কেমন হতে পারে? পার্থিব জীবন আর পরকালীন জীবনের যোগসূত্র কী?

পরলোকগত কুয়েতি এক লেখক আবদুল্লাহর ফেসবুক পোস্ট থেকে তা জানার চেষ্টা করি। মৃত্যুর আগে লিখে যাওয়া তার কিছু অনুভূতি-

মৃত্যু নিয়ে আমি কোনো দুশ্চিন্তা করব না, আমার মৃতদেহের কী হবে সেটা নিয়ে কোনো অযথা আগ্রহ দেখাব না। আমি জানি আমার মুসলিম ভাইয়েরা করণীয় সবকিছুই যথাযথভাবে করবে।

তারা প্রথমে আমার পরনের পোশাক খুলে আমাকে বিবস্ত্র করবে, আমাকে গোসল করাবে,
(তারপর) আমাকে কাফন পরাবে,
আমাকে আমার বাসগৃহ থেকে বের করবে,
আমাকে নিয়ে তারা আমার নতুন বাসগৃহের (কবর) দিকে রওনা হবে,
আমাকে বিদায় জানাতে বহু মানুষের সমাগম হবে,
অনেক মানুষ আমাকে দাফন দেয়ার জন্য তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম কিংবা সভার সময়সূচি বাতিল করবে,
কিন্তু দুঃখজনকভাবে অধিকাংশ মানুষ এর পরের দিনগুলোতে আমার এই উপদেশগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে না,
আমার (ব্যক্তিগত) জিনিসের ওপর আমি অধিকার হারাব,
আমার চাবির গোছাগুলো,
আমার বইপত্র,
আমার ব্যাগ,
আমার জুতোগুলো,
হয়তো আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে উপকৃত করার জন্য আমার ব্যবহারের জিনিসপত্র দান করে দেয়ার বিষয়ে একমত হবে,
এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত থেক যে,
এই দুনিয়া তোমার জন্য দুঃখিত হবে না,
অপেক্ষাও করবে না,
এই দুনিয়ার ছুটে চলা একমুহূর্তের জন্যও থেমে যাবে না,
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু চলতে থাকবে,
আমার দায়িত্ব (কাজ) অন্য কেউ সম্পাদন করা শুরু করবে,

আমার ধনসম্পদ বিধিসম্মতভাবে আমার ওয়ারিশদের হাতে চলে যাবে,
অথচ এর মাঝে এই সম্পদের জন্য আমার হিসাব-নিকাশ আরম্ভ হয়ে যাবে,
ছোট এবং বড় অনুপরিমাণ এবং কিয়দংশ পরিমাণ, (সবকিছুর হিসাব) আমার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম যা (হারাতে) হবে, তা হলো আমার নাম!
কেননা, যখন আমি মৃত্যুবরণ করব, তখন তারা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলবে, কোথায় লাশ?
কেউ আমাকে আমার নাম ধরে সম্বোধন করবে না,
যখন তারা আমার জন্য (জানাজার) নামাজ আদায় করবে, বলবে, 'জানাজায়' নিয়ে আসো, তারা আমাকে নাম ধরে সম্বোধন করবে না...!
আর, যখন তারা দাফন শুরু করবে বলবে, মৃতদেহকে কাছে আনো, তারা আমার নাম ধরে ডাকবে না...!
এজন্যই দুনিয়ায় আমার বংশ পরিচয়,
আমার গোত্র পরিচয়,
আমার পদমযার্দা এবং আমার খ্যাতি কোনো কিছুই আমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে,
এই দুনিয়ার জীবন কতই না তুচ্ছ,
আর যা কিছু সামনে আসছে তা কতই না গুরুতর বিষয়...
অতএব, (শোনো) তোমরা যারা এখনো জীবিত আছো জেনে রাখো, তোমার (মৃত্যুর পর) তোমার জন্য তিনভাবে দুঃখ করা হবে,
১. যারা তোমাকে বাহ্যিকভাবে চিনত, তারা তোমাকে বলবে হতভাগা।
২. তোমার বন্ধুরা বড়জোর তোমার জন্য কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন দুঃখ করবে, তারপর তারা আবার গল্পগুজব বা হাসিঠাট্টাতে মত্ত হয়ে যাবে।
৩. যারা খুব গভীরভাবে দুঃখিত হবে, তারা তোমার পরিবারের মানুষ, তারা এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, এক মাস, দুই মাস কিংবা বড়জোর এক বছর দুঃখ করবে। এরপর তারা তোমাকে স্মৃতির মণিকোঠায় যত্ন করে রেখে দেবে।
মানুষদের মাঝে তোমাকে নিয়ে গল্প শেষ হয়ে যাবে,
অতঃপর,
তোমার জীবনের নতুন গল্প শুরু হবে, আর তা হবে পরকালের জীবনের বাস্তবতা,
তোমার নিকট থেকে নিঃশেষ হবে (তোমার) :
১. সৌন্দর্য
২. ধনসম্পদ
৩. সুস্বাস্থ্য
৪. সন্তান-সন্ততি
৫. বসতবাড়ি
৬. প্রাসাদসমূহ
৭. জীবনসঙ্গী
তোমার নিকট তোমার ভালো অথবা মন্দ আমল ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট্য থাকবে না,
শুরু হবে তোমার নতুন জীবনের বাস্তবতা,

আর, সে জীবনের প্রশ্ন হবে : তুমি কবর আর পরকালের জীবনের জন্য এখন কী প্রস্তুত করে এনেছ?
বস্তুত এই জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে তোমাকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।
এজন্য তুমি যত্নবান হও,
১. ফরজ ইবাদতগুলোর প্রতি
২. নফল ইবাদতগুলোর প্রতি
৩. গোপন সাদাকাহর প্রতি
৪. ভালো কাজের প্রতি
৫. রাতের নামাজের প্রতি
যেন তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারো।
এই লেখাটির মাধ্যমে তুমি মানুষকে উপদেশ দিতে পারো, কারণ তুমি এখনো জীবিত আছো।
এর ফলাফল আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি কিয়ামত দিবসে মিজানের পাল্লায় দেখতে পাবে,
আল্লাহ বলেন : (আর স্মরণ করিয়ে দাও, নিশ্চয়ই এই স্মরণ মুমিনদের জন্য উপকারী)
তুমি কি জানো কেন মৃতব্যক্তিরা সাদাকাহ প্রদানের আকাঙ্ক্ষা করবে, যদি আর একবার দুনিয়ার জীবনে ফিরতে পারত?
(হে আমার রব! যদি তুমি আমাকে আর একটু সুযোগ দিতে দুনিয়ার জীবনে ফিরে যাবার, তাহলে আমি অবশ্যই সাদাকাহ প্রদান করতাম...)
তারা বলবে না-উমরাহ পালন করতাম,
অথবা সালাত আদায় করতাম,
অথবা রোজা রাখতাম,
আলেমগণ বলেন- মৃতব্যক্তিরা সাদাকাহর কথা বলবে, কারণ তারা সাদাকাহ প্রদানের ফলাফল তাদের মৃত্যুর পর দেখতে পাবে, আর গুরুত্ববহ এই সাদাকাহর কাজটি তুমি নিজে এই কথাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে মাত্র এক মিনিট সময় ব্যয় করে অর্জন করতে পারো দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ, যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় এর মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ প্রদান করা।
কারণ, উত্তম কথা হলো এক ধরনের সাদাকাহ।
আমিন।

টাইম ম্যানেজমেন্ট মানে শুধু অঢেল অর্থ সম্পত্তির মালিক হওয়া নয়। বরং আপনি শিক্ষায়, আচরণে, ন্যায়পরায়ণতায়, সত্যবাদিতায় সর্বোপরি ইসলামিক জীবনব্যবস্থায় কতটা সফল হলেন, কতটা ধনী হলেন- সেটাই বড় ব্যাপার।

আপনি এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরুন। আপনিই হবেন সবচেয়ে বেশি সফল। সবচেয়ে বেশি ধনী। সবচেয়ে বেশি সুখী মানুষ। ইহকালে ও পরকালে।

এমন জীবন হবে করিও গঠন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

....

তথ্য ও সাহায্য সূত্র :

১. আল কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও তার তরজমা ও তাফসির : https://www.hadithbd.com/
২. আল কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও তার তরজমা ও তাফসির : http://www.quraanshareef.org/
৩. সহিহুল মুসলিম, কৃত- ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ।
৪. সহিহুল বুখারি, কৃত- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারি।
৫. https://bn.quora.com/
৬. HISTORY OF ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT,BY: M. NEJATULLAH SIDDIQUI, JEDDAH, 1992,
৭. ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কৃত- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম।
৮. https://banglanews24.com/islam
৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থা, মনজের কাহফ, বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটি, নভেম্বর ২০০৪।
১০. https://www.kalerkantho.com/
১১. দারিদ্র্য বিমোচনের ইসলামি পদ্ধতি, কৃত- মুহাম্মদ আবু জাফর।
১২. দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, সম্পাদনায়- নুরুল ইসলাম মানিক, ইফা।
১৩. www.prothomalo.com
১৪. https://news.priyo.com/
১৫. http://www.islamientertainment.com/
১৬. https://banglanews24.com/
১৭. https://www.risingbd.com/
১৭. https://www.deshrupantor.com/
১৮. প্রোডাকটিভ হ্যাপিনেস ইউথ ইসলাম- জোবায়ের রুবেল
১৯. মাইন্ডফুলনেস হ্যাপিনেস- জোবায়ের রুবেল
২০. টাইম ম্যানেজমেন্ট, ব্রায়ান ট্রেসি, অনুবাদ- রিফাহ জাহরা